নেই কিশোর প্রেম নয়

নিউক্লিয়ার বোমা নয়

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বিংশ বর্ষ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা জুলাই-ডিসেম্বর 1998

পি 252, লেক টাউন, ব্লক A,

কলকাতা 700 089

সূ চী প ত্র

আমাদের কথা..... 3

পোখরান অতঃপর [7—52]

পোখরান : ঊনিশো আটানববই..... 8 ❑ Science Politics and the Bomb : Pokhran II .....14 ❑ পোখরান সংলগ্ন গ্রামের মানুষ এবং কয়েকজন হিবাকুশা.....18 ❑ ভারতের পরমাণু প্রকল্প : কথায় ও কাজে .....21 ❑ ভারত পাকিস্তানের অস্ত্র প্রতিযোগিতা সম্পর্কে.....28 ❑ 'গ্রীনপিস' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার.....33 ❑ পরমাণুবোমার মানসিকতা—ভারতে.....36 ❑ বহুল উচ্চারিত সিটিবিটি-র স্বরূপ.....42 ❑ আর নিউক্লিয় পরীক্ষা নয়, আর বোমা নয়.....49

পারমাণবিক বিস্ফোরণ : মতামত [53—59]

হিরোশিমা : ফিরে দেখা [60—74]

প্রথম পরমাণু বোমটি .....61 ❑ নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে জাপান.....63 ❑ হিরোশিমা-নাগাসাকি 1945.....66

অতীতের কথা [75—92]

বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি .....76 ❑ বিজ্ঞানের বিভীষিকা .....79 ❑ নিউক্লিয়ার যুদ্ধ : প্রকৃত বিপদ.....84 ❑ পারমাণবিক জাতীয়তাবাদ ও পারমাণবিক আইন.....89

অস্ত্র-বিরোধী ঘোষণা [93—102]

পাগওয়াশ আন্দোলনের পটভূমি..... 94 ❑ 9235 জন বিজ্ঞানীর আবেদন.....98 ❑ ভিয়েনা ঘোষণাপত্র 1958.....99

আদালতে আর্জি [103—111]

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে প্রেরিত আবেদনপত্র .....100 ❑ আপনিও আবেদন করুন.....110

বিক্ষোভপ্রতিবাদমিছিলসমাবেশআবেদনআন্দোলনআলোচনা.....[112—124]

.... সুদূর আমেরিকায় কর্মরত ভারত ও পাকিস্তানের গবেষক.....113 ❑ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে.....113 ❑ পাকিস্তানে প্রতিবাদী উদ্যোগ.....115 ❑ দক্ষিণ এশীয়দের প্রতিবাদপত্র.....119 ❑ পাকিস্তানে পরমাণু বোমাবিরোধী সমাবেশে হামলা.....121 ❑ Indian Scientists Against Nuclear Weapons...121 ❑ শ্রীনগরে ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের হামলা.....121 ❑ বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রতিবাদ.....122 ❑ প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশ : এদেশে.....122 ❑ প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশ : বিদেশে.....123

পরিক্রমা [125—127]

এক নজরে ভারতের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড.....125 ❑ ভারতের মিসাইল ও সাবমেরিন কর্মকাণ্ড.....125 ❑ বিশ্বজুড়ে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের খতিয়ান.....126 ❑ *'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'*-তে নিউক্লিয়ার বিষয়ে প্রকাশিত রচনা.....128

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

আমাদের কথা

উদ্‌ধৃতিটি বার্ট্রান্ড রাসেলের। 1954 সালের ডিসেম্বরে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ে বি বি সি রেডিওতে দেওয়া বক্তৃতাটি তিনি শেষ করেন এই কথা বলে। স্মরণীয় হয়ে আছে এই বক্তৃতা। কারণ এর পর থেকেই শুরু হয় অস্ত্র প্রতিযোগিতা নিয়ে সংগঠিত প্রতিবাদ। বহু মানুষ একত্রিত হন ক্রমে। যার শিরোভাগে ছিলেন রাসেল স্বয়ং। একাধিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে অংশ নেন বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লেখক সাহিত্যিক। সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব পাঠানো হয় বিবদমান রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে। আমাদের এই ভূখণ্ডেও আজ শুরু হয়েছে অনুরূপ অস্ত্র-দৌড়। ভারত এবং পাকিস্তান সরকার অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে যুদ্ধোন্মাদনা। আমরা উভয় সরকারেরই এই আচরণের তীব্র নিন্দা করছি এবং এর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করছি।

এই ভূখণ্ডে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শুরু করে চীন সেই উনিশশো চৌষট্টি সালে। দশ বছর বাদে অনুরূপ পরীক্ষা চালায় ভারত। চব্বিশ বছর বাদে ফের সেই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি হলো। কোনো দিক থেকে কোনোরকম প্ররোচনা ছাড়াই। বিগত পঞ্চাশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন মিলে

'I appeal, as a human being to human beings : remember your humanity, and forget the rest. If you can do so, the way lies open to a new paradise; if you cannot, nothing lies before you but universal death'.

Burtrand Russel

দু-হাজারের বেশি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি ন-দিনে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একটি করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। সব থেকে বীভৎস পরীক্ষাটি চালিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুটি জনবহুল শহরের ওপর বোমা ফাটিয়ে। 1945 সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর দুটি বোমা ফাটিয়ে তারা যাচাই করেছে পারমাণবিক বোমার ধ্বংস-ক্ষমতা। পরীক্ষা সফল হয়েছিল! কারণ তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে, পঙ্গু হয়েছে এবং সর্বোপরি এই ধ্বংসকাণ্ড সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে বংশানুক্রমে বহু বিকৃত মানবশিশুর জন্ম হয়েছে এবং হচ্ছে আজও। এজন্য সেদিনও নিশ্চয়ই অনেকে গর্বিত বোধ করেছিলেন এবং সরকারের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিলেন।

ব্যাপক গণহত্যার জন্য জার্মানীর ফ্যাসিস্ট নেতৃবৃন্দের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হলেও মার্কিন নেতাদের নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও হয়নি। বন্ধ হয়নি সেই বোমাকে আরও নিখুঁত এবং ধ্বংসাত্বক করে তোলার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। উপরোক্ত পাঁচটি দেশের হাতে মোট মজুত বোমার সংখ্যা আমাদের সমস্ত কল্পনাকে ছাপিয়ে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি আজ। যা দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি জীবনকে ধ্বংস করা যায় অন্তত পাঁচবার। পারমাণবিক অস্ত্রের গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই শুধু গত আটচল্লিশ থেকে একানব্বই সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খরচ করেছে গড়ে বছরে তিনশো সত্তর কোটি ডলার। এটা শুধু গবেষণা খাতেরই খরচ। এহেন গবেষণায় উদ্যোগী ভারত এবং পাকিস্তান সরকারও। এই গবেষণায় অর্থের অভাব হয়নি কখনই। যদিও অর্থের অভাবে পীড়িত অন্যান্য হাজারো ক্ষেত্রের গবেষণা। অর্থ যেখানে গ্লামারও সেখানে। সেখানেই ভিড় মেধাবী গবেষকদের। তুলনা নেই এই অপচয়ের। বোমা প্রকল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানী ও কারিগরেরা তারিফ পেয়েছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে। পেয়েছেন দেশপ্রেমিক আখ্যা। এই সব দেখে শুনে পেটো বানানোয় ওস্তাদ এক ব্যক্তি নাকি খেদোক্তি করেছে : 'পেটো বাঁধি বলে লোকে বলে সমাজ বিরোধী। আর বড় বোমা বানালে 'দেশপ্রেমিক'!

এটা মনে করার কারণ নেই যে, অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগে অথবা মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সমস্ত বিজ্ঞানী ও কারিগরেরাই এই 'দেশপ্রেমিক' আখ্যায় উল্লসিত। কাগজে-পত্রে যাদের নামে এমন ধ্বনি উঠেছে তারা নেহাতই কিছু ম্যানেজার শ্রেণীর লোক। সাধারণ গবেষক কর্মীদের মনোভাব জানা গেছে সম্প্রতি 'হ্যাকারদের' দ্বারা উদ্ধার করা ই-মেইলের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতার থেকে।

ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক এই বোমার পরীক্ষায় অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন —অনেক ব্যক্তি , সংগঠন, রাষ্ট্রপ্রধান। এদের সবাইকে এক গোত্রের বা তাদের উদ্বেগের কারণ এক মনে করলে ভুল হবে। কারণ এই দলে তারাও আছে যারা হাজার হাজার পরমাণু বোমা অন্যের দেশের দিকে তাক করে সাজিয়ে রেখেছে, তারাও আছে যারা একটিও মজুত বোমা নিস্ক্রিয় করতে অরাজি, তারাও আছে যারা

তলে তলে এই বোমার মাল-মশলা-কারিগরি যোগান দেয় অন্য দেশে, তারাও আছে যারা এই কিছুদিন আগেও বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য করে চালিয়েছে এই বোমার পরীক্ষা (যেমন ফ্রান্স ও চীন)। এই ভণ্ডদের ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্যই ভারত ও পাকিস্তানের সরকার এমন মরিয়া। ভারত সরকার এই ক্লাবের দোর গোড়াতে পা রেখেই তাই আহ্বান রেখেছে—'আর নয়, এবার বন্ধ হোক বোমার পরীক্ষা'!

ভারত ও পাকিস্তান সরকারের এই উন্মত্ততা কোথায় নিয়ে ফেলবে এই ভূখণ্ডের মানুষকে সেই ভাবনায় উদ্বেলিত আমাদের মন। এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে জানা কথা। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন বেড়ে যাবে। শুরু হবে অস্ত্র প্রতিযোগিতা। নতুন ধরণের অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। যার আর্থিক বোঝা বইতে হবে দু-দেশের দরিদ্র জনসাধারণকেই। লাভের কড়ি গুণবে বিদেশী অস্ত্রসরঞ্জামের কারবারীরা আর এই দু-দেশের দালাল কন্ট্রাক্টরেরা।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সরকারের এমন অপকর্মের সমর্থকের অভাব হলো না দু-দেশেই। ডান-বাম-নির্বিশেষে দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্তম্ভিত করেছে আমাদের। আপত্তি ওজর যত কিছু নিছকই কৌশলগত কারণেই। আশ্চর্যরকমভাবে নীরব থেকেছে দেশের বুদ্ধিজীবী নামাঙ্কিত অংশের বেশির ভাগ। এই নীরবতার মধ্যে শোনা গেছে তাদেরই কণ্ঠ যারা ক্ষমতায় আসীন লোকেদের যুক্তির খাতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নিজেদের ভাবনাকে। দেশের গৌরব, বিজ্ঞানীদের সাফল্য, দেশের নিরাপত্তা ইত্যাদি উত্তেজক ভাবনায় মশগুল হয়ে রায় দিয়েছেন বোমা-পরীক্ষার সপক্ষে। বিরোধিতায় সরব হয়েছেন যারা, সংখ্যায় নেহাতই নগণ্য তারা।

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর তাবৎ দেশেই এই চিত্র —ধনী নির্ধন নির্বিশেষে। হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে সমরাস্ত্র সম্ভার বাড়িয়েই চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই সে-দেশের সাধারণ মানুষের অথবা পত্র পত্রিকা প্রচার মাধ্যমের। অথচ জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের অনেক কিছুই সমাজের এক অংশের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে সে-দেশেও। অর্থাৎ মানুষের দুর্ভাবনা বেশি দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে! অধিকাংশের আজও ভয় কমিউনিস্টরা যদি দখল করে নেয় তাদের দেশ! ক্রমাগত প্রচারে এমনটাই বোঝানো হয়েছে তাদের। তারাও বিশ্বাস করে এমন উদ্ভট যুক্তি। যেমনটা অন্যভাবে বোঝানো হচ্ছে আমাদের এখানেও। এমন যুক্তি বিশ্বাস করে না যারা, তাদের সংখ্যা নগণ্য। যেমন এদেশে, তেমন আমেরিকাতেও। ইওরোপের চিত্র একটু ভিন্ন। ভিন্ন, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি তারা।

বিওবি সেই মুষ্টিমেয় অবিশ্বাসীদের দলেই। যারা মনে করে প্রতিরক্ষার নামে দেশের সরকার যা করছে তা শুধু উদ্ভটই নয়, দেশের ভবিষ্যতের পক্ষেও বিপজ্জনক। পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এ নিয়ে বহু কথা বলেছেন লিখেছেন। নতুন করে বলার প্রায়

কিছুই নেই। তাই এবারের *বিওবি* সাজানো হয়েছে বেশ কয়েকটি পুরনো লেখা দিয়েই। বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং-এর দেওয়া বক্তৃতা অথবা বার্ট্রান্ড রাসেলের তৈরি করা বয়ান অথবা রাজশেখর বসুর বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে সমালোচনা আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে আমাদের। তেমন কিছু পুরনো দলিলের সাথে অল্প কিছু নতুন লেখা, মন্তব্য এবং সংখ্যাতত্ত্ব সংযোজিত হলো এই সংখ্যায়। ভারতের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বহু লেখা *বিওবি*-র পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছে গত বিশ বছর ধরে। এই কর্মকাণ্ড যে নিছক শান্তির উদ্দেশ্যেই নয়, তা নিয়ে এক নাগাড়ে বলেও এসেছে *বিওবি*; অনেকের কাছেই তা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে তখন। কিন্তু সেই আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হলো আজ। সকলের অবগতির জন্য সেই প্রবন্ধ এবং মন্তব্য গুলির একটি তালিকা প্রকাশ করা হল এই সংখ্যায়। *বিওবি*-র আঙ্গিক একটু বদলানো হলো — কেবল এই সংখ্যার জন্যই। কলেবরও অনেকটাই বেড়ে গেল। তবুও অনালোচিত থেকে গেল বহু বিষয়ই — তোলা রইল আগামীদিনের জন্য।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন যে আপনাদের গ্রাহকপদ রিনিউ করে নিন। বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা কুড়ি টাকা। মানি অর্ডারযোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাতে পারেন। মানি অর্ডার কুপনের নীচে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখতে ভুলবেন না।

ঠিকানা ঃ প্রযত্নে অভিজিৎ লাহিড়ী
পি ২৫২ লেক টাউন, ব্লক এ
কলকাতা-৭০০ ০৮৯

পোখরান অতঃপর

একবিংশ শতাব্দীর শেষ বেলায় পৌঁছে ভারত আজ পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভারে স্বনির্ভর। এটা আজ আর শুধু অনুমান নয়। দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে সেই ঘটনা — পোখরানে। ভারত সরকার চব্বিশ বছর পর দ্বিতীয়বার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার শক্তির প্রবলতাকে জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ববাসীকেও। কিন্তু কেন পোখরান? কী এর ভেতর-বাইরের রাজনীতি। একশো কোটি জনসংখ্যার দেশের বড় অংশ মানুষ যেখানে দুবেলা ভাত পায় না সেখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেশের মানুষকে ধোঁকা দেবার প্রবণতা কোন্ ভাবনায়? 'লিটল বুদ্ধ স্মাইলিং'-এর প্রবক্তাদের চেয়ে দেশের মানুষের 'না-বোমা'-র সপক্ষে যুক্তির ধার কিন্তু কম নয়। কিন্তু ...।

পোখরান : ঊনিশশো আটানব্বই

রবীন চক্রবর্তী

এগারোই মে, ঊনিশশো আটানব্বই, সোমবার বেলা পৌনে চারটে। বুম্ বুম্ বুম্...। কেঁপে উঠল পোখরানের মরুভূমি।—ভূমিকম্প যেন। আতঙ্কিত হয়ে উঠল আশপাশের গ্রামের মানুষ। আসল কারণ জানা গেল সন্ধ্যায়। রেডিও টেলিভিশনের খবর প্রচারিত হলো যখন। জানা গেল, বসুন্ধরা নিজের খেয়ালে কেঁপে ওঠেনি, তাকে কাঁপানো হয়েছিল ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। একটি নয়, তিন ধরণের তিনটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে। তাইতেই এই কাঁপুনি, যার রিক্টার মাত্রায় মাপ 4.7। সুদূর ব্রিটিশ জিওলজিকাল সার্ভের যন্ত্র থেকেও যার স্বীকৃতি মিলেছে। ঠিক চব্বিশ বছর আগে এমনই একটি সময়ে (আঠেরই মে) প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল ভারত। পোখরানের মরু এলাকাতেই। তারপর ফের এই বিস্ফোরণ। বিস্তৃত বিবরণ এবং নানান দিক থেকে এর প্রতিক্রিয়া জানা গেল পরের কয়েক দিনের দৈনিক ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার মাধ্যমে।

বারোই মে, মঙ্গলবার। সমস্ত পত্রপত্রিকার শিরোনামে এই বিস্ফোরণের সংবাদ। ভূগর্ভে পর পর তিনটি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে ভারত কাঁপিয়ে দিয়েছে দুনিয়া। সরকারি তরফে জানানো হয়েছে—দেশের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই চবিবশ বছর বাদে ফের এই

এগারোই মে ঊনিশশে আটানব্বই-এর অপরাহ্ন বেলায় রাজস্থানের পোখরান ভারতের মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদ্ আর বিজ্ঞানীদের হাতে দ্বিতীয়বার ধর্ষিত হলো। এ-খবরে শান্তিপ্রিয় কিন্তু পরিবেশ দূষণ-ভীত মানুষ, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অস্তিত্বের ভয়ে ভীত মানুষ আবারো চীৎকার করে উঠতে চেয়েছে — যদিও তারা মুষ্টিমেয়। কিন্তু কি ঘটেছে সেখানে, এবং কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ের খতিয়ান 'পোখরান : ঊনিশশো আটানব্বই'।

বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং বলা হলো যে এই সফল পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ হলো যে ভারত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে সক্ষম। এই ধরণের পরীক্ষার থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাপের, প্রকৃতির এবং বিভিন্ন ধরণের বাহনের উপযোগী বোমা বানানো সম্ভব হবে এর পর।

তিনটি বিস্ফোরণের একটি ছিল পরিচিত প্রমাণ মাপের ফিশন বোমা। যার বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল 15 কিলো টন টিএন টি-র সমান। অর্থাৎ পনের হাজার টন ট্রাইনাইট্রো টলুইন বিস্ফোরকের সমান ক্ষমতার। অন্য দুটির প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। একটি ছিল ছোট মাপের সাব ক্রিটিকাল বোমা। যা বিস্ফোরণ ক্ষমতার দিক থেকে কিলোটন মাপের থেকে ছোট (0.2 কিলোটন)। বড় ধরণের বোমা যেখানে বড় বড় শহরের ওপরে ফেলে শহর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, সেখানে 'সাব ক্রিটিকাল' বোমা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ব্যবহারের লক্ষ্যে তৈরি। এর গুরুত্ব শুধুমাত্র এজন্যই নয়। এই বোমার পরীক্ষা সিটিবিটি-র নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। আর এই বোমার পরীক্ষা থেকে সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটারে দিয়ে, এর সাহায্যে নতুন ধরণের এবং যে কোনো মাত্রার বোমার কার্যকারিতা নির্ণয় করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। এজন্য ঘটা করে আর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। নিউক্লিয়ার অস্ত্রধর পাঁচটি দেশ এই ধরণের 'সিমিউলেটেড' পরীক্ষার কৌশল বার করার পরেই রাজি হয়েছে সিটিবিটি-তে সই করতে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও এই দক্ষতা অর্জন করেছে বলে দাবি করছেন। ফলে, এখন আর অসুবিধে নেই ভারতের ওই চুক্তিপত্রে সই করায়।

সরকারি মুখপত্রের বিবরণী থেকে জানা গেল তারা সব থেকে খুশি থার্মোনিউক্লিয়ার বা তথাকথিত ফিউশন বোমার পরীক্ষায় সফল হয়েছে বলে। তৃতীয় বিস্ফোরণটি ছিল ওই ধরণের বোমার। এই বোমা বানানোর দক্ষতা অর্জন করার ফলেই নাকি চমকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে পশ্চিমের রাষ্ট্রপ্রধানদের। এই সাফল্য নাকি সম্ভব হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ফলে। কিছুদিন আগে ডয়েটেরিয়াম থেকে তেজস্ক্রিয় ট্রাইটিয়াম পৃথকীকরণের একটি উপায় উদ্ভাবন করেছে কলপক্কমের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা। ট্রাইটিয়াম ব্যবহৃত হয় বোমার বিস্ফোরণ মাত্রা বাড়ানোর কাজে। 'ক্রিটিকাল মাসে'র বাধ্যবাধকতা নেই ফলে বহনকারী যানের ওজন এবং পাল্লার উপযোগী ছোট বড় যে কোনো বিস্ফোরণ ক্ষমতার বোমা বানানো যায় এই পদ্ধতিতে। পরীক্ষিত বোমাটি ছিল 45 কিলোটন মাপের। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, চুয়াত্তর সালের বোমাটির ওজন ও আকৃতি দুদিক থেকেই বেঢপ ধরণের বড় ছিল। এবারের বোমাগুলো ছিল তুলনায় অনেক ছোট।

দুশো থেকে তিনশো মিটার গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটির নীচে এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে দূরে সেগুলো বসানো হয়েছিল। পরীক্ষাস্থল থেকে নিকটতম গ্রাম খেটোলাই-এর দূরত্ব ছিল পাঁচ কিলোমিটার। তিনটি বোমা প্রায় এক সাথেই ফাটানো হয়েছিল—দূর থেকে ইলেকট্রিকাল ট্রিগারিং এর মাধ্যমে। মাটির

নীচে পাথুরে স্তরে ঘটানো হয় এই বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ফলে তাপমাত্রা উঠে যায় প্রায় কয়েক লক্ষ ডিগ্রীতে এবং যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তাতে চকিতে প্রায় ছোটখাট একটি পাহাড়ের সমান পাথর গলে যায় এবং বাষ্পীভূত হয়। উচ্চ চাপ এবং বিস্ফোরণের প্রবল ধাক্কায় কেঁপে ওঠে ভূপৃষ্ঠ। ঠিক যেমন হয় ভূমিকম্পের ফলে। যেটা ধরা পড়ে ভূকম্পনমাপক যন্ত্রে। দূর থেকে এই পরীক্ষাস্থল যারা দেখার সুযোগ পেয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা হলো ফুল সাইজের ফুটবল মাঠের মতো এলাকার মাটি যেন হঠাৎ কয়েক মিটার ওপরে উঠেই পড়ে গেল! পরীক্ষার শেষে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে ভয়ের কোনো কারণ নেই। বিন্দুমাত্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বাইরে ছড়ায়নি।

বস্তুতপক্ষে সেটা যে ঠিক নাও হতে পারে তা জানা গেল পরবর্তীকালে অন্য অনেকের বক্তব্য থেকে। যেমন গ্রীনপীসের এক প্রতিনিধি দল এসেছিল এদেশে। তারা জানাল যে, পৃথিবীতে ভূগর্ভে যত বিস্ফোরণের পরীক্ষা হয়েছে তার প্রতি তিনটিতে অন্তত একটির ক্ষেত্রে কিছু কিছু গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর সেই গ্যাসের সাথে বয়ে নিয়ে এসেছে তেজস্ক্রিয়তা। ফলে এক্ষেত্রেও এতগুলি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে তার কোনোটা থেকে তেমন কোনো গ্যাস বেরিয়ে এসে থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে সরকারের উচিত পরীক্ষাস্থলটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। যাতে তারা নিজেরা প্রয়োজনে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। ফ্রান্স যেমন বছর দুয়েক আগে মুরুরোয়া আতোলে তাদের পরীক্ষাস্থল আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে খুলে দিয়েছে পরীক্ষার জন্য। এছাড়া ভূগর্ভের পরীক্ষার ফলে মাটির তলার জল দূষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দিন কয়েক পরের পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে পরীক্ষাস্থল লাগোয়া এলাকার লোকেদের কিছু কিছু শারীরিক অসুস্থতা যেমন নাক দিয়ে রক্ত পড়া, চোখ জ্বালা, শরীরে অস্বস্তি, বমি বমি ভাব ইত্যাদির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। হঠাৎ একযোগে কিছু লোকের এমন লক্ষণ দেখা দেওয়ায় অনেকে এর সাথে বোমার পরীক্ষার সম্বন্ধ থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছেন।

এই তো গেল বোমার পরীক্ষার পর্ব। এর পরে আছে তাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। অর্থাৎ বিভিন্ন মাপে বিভিন্ন পাল্লার বাহনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা এবং সংখ্যায় বাড়িয়ে তোলা। এই নিয়ে বিস্তর মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ওই দিনকার পত্রপত্রিকায়। ভারত মূলত প্লুটোনিয়াম-239 নির্ভর বোমা তৈরিতে আগ্রহী। এর প্রাথমিক সুবিধে হলো ইউরেনিয়াম-235-এর তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কম মশলাতেই কাজ হয়। আর ভারতের যথেষ্ট পরিমাণে প্লুটোনিয়াম তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিঅ্যাক্টরগুলো সেইভাবেই নির্বাচন করা হয়েছিল। দেশের দশটি রিঅ্যাক্টর থেকে বছরে প্রায় পঁচাত্তর থেকে দুশো কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম প্রয়োজন তার তুলনায় অনেকগুণ বেশি এই পরিমাণ। ফলে রিপ্রসেসিং করার পর বোমার উপযোগী প্লুটোনিয়াম-239 হাতে থাকে অনেকটাই। সেই দিক থেকে পাকিস্তান খানিক অসুবিধেজনক অবস্থায়

আছে আপাতত। কারণ সেখানে বোমার জন্য ইউরেনিয়াম-235-এর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে এখনও। এবং অনুমান করা হয়, ওদের যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম মজুত আছে তাতে পনেরো থেকে কুড়িটির বেশি বোমা বানানো সম্ভব নয়। অন্তত এই মুহূর্তে। তবে ওরাও প্লুটোনিয়াম রিপ্রসেসিং-এর প্ল্যান্ট বসাচ্ছে। যা থেকে বছরে দশ থেকে পনেরো কিলোগ্রাম বোমার উপযোগী প্লুটোনিয়াম 239-তৈরি করতে পারবে এবং যা দিয়ে গোটা দুয়েক করে বোমা বানাতে পারবে।

তবু বোমা হলেই হলো না—তাকে যথাস্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা প্রয়োজন। বারোই মে তারিখেই খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট আরেকটি খবর ছিল। এগারোই মে বেলা একটা নাগাদ উড়িষ্যার চাঁদিপুর লঞ্চিং-প্যাড থেকে ত্রিশূল নামে একটি মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে। অর্থাৎ ভারতে পারমাণবিক বোমা এবং মিসাইল তৈরির কার্যক্রম হাত ধরাধরি করেই চলছে। মিসাইলের গুরুত্ব এতদূর পৌঁছেছে যে, মিসাইল কর্মকাণ্ডের কর্ণধার সম্প্রতি 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। লক্ষণীয় যে, এ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদের ভাগ্যে জোটেনি দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মান।

ভারত ইতিমধ্যেই দেড়শো থেকে আড়াইশো কিলোমিটার পাল্লার পৃথ্বী এবং দেড় থেকে আড়াই হাজার কিলোমিটার পাল্লার অগ্নি মিসাইল তৈরির দক্ষতা অর্জন করেছে। বাকি রয়েছে এর ওপর বোমাগুলিকে ঠিকঠাক করে বসানো। ভারতের লক্ষ্য আরও দূরে। আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ। শোনা যাচ্ছে, সূর্য নামের সেই মিসাইলের কাজেও সবুজ সংকেত মিলে গেছে। যার নিজের ওজনই হবে চল্লিশ হাজার কিলোগ্রামের মতো এবং যেটা মেগাটন মাপের অস্ত্র বয়ে নিয়ে যেতে পারবে বারো হাজার কিলোমিটার অবধি। অপরপক্ষে পাকিস্তান সরকারও বসে নেই। তারা ইতিমধ্যেই চীনের কাছ থেকে

ভারতের হাতে যে মিসাইল আছে তার পাল্লা

	স্বল্প দূরত্ব (Km)	মাঝারি দূরত্ব (Km)	দূরপাল্লার (Km)
স্থল থেকে স্থল	70 কিমি পর্যন্ত	70-250	250-12,000
স্থল থেকে আকাশ	10 কিমি পর্যন্ত	10-25	25-200
আকাশ থেকে স্থল	10 কিমি পর্যন্ত	10-20	20-70
আকাশ থেকে আকাশ	5 কিমি পর্যন্ত	5-10	10-100
ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী	2 কিমি পর্যন্ত	2-4	4-6
জাহাজ বিধ্বংসী	10 কিমি পর্যন্ত	10-40	40-120

পেয়েছে ভারতরে পৃথ্বীর তুল্য ছত্রিশটি M11 মিসাইল। পাকিস্তানের নিজের দেশে প্রস্তুত চারশো থেকে সাতশো কিলোমিটার পাল্লার ঘাউড়ি মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ করেছে সম্প্রতি। এছাড়াও তাদের দূরপাল্লার অগ্নি মিসাইলের সমতুল 'গজনী'র প্রস্তুতিপর্বও চলছে জোর কদমে। ফলে অচিরেই দু-দেশের সরকার পরস্পরের দিকে যথেষ্ট সংখ্যক বোমা বোঝাই মিসাইল তাক্ করে রাখতে পারবে।

এই বিস্ফোরণ রাজধানীর রাজনৈতিক মহলেও নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সকলেই। চব্বিশ দিনের নবীন সরকার এক ধাক্কায় বেহাল করে দিয়েছে সবাইকে। বিরোধী দলগুলো যে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। পারমাণবিক বোমার প্রস্তুতিপর্বে কোনো আপত্তি তোলেনি কখনো। এখন পরীক্ষার পরে তাকে নিন্দা করে কিভাবে? এদিকে একে স্বাগত জানাতে গেলে তার গৌরব গিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষ বিজেপি দলের মাথায়। ফলে উভয়সঙ্কট তাদের। কংগ্রেসের অবশ্য এতে সন্তোষ প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ এর পরিকল্পনা ছিল তাদেরই তৈরি। ফলে এই ঘটনাকে স্বাগত জানাল তারা। তবে এর সাথে যোগ করতে ভুলল না যে, এর গৌরবের ভাগীদার তারাও। বামপন্থী দলগুলির অবস্থা হয়েছিল সব থেকে করুণ। এগারো তারিখ সন্ধ্যায় সিপিআই বা সিপিআই-(এম) দলের কোনো বড় কর্তাকেই ধরতে পারেনি সাংবাদিকরা। ফলে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারেনি। সিপিআই দলের এক মাঝারি মাপের নেতাকে ধরাতে তিনি যা বলেছিলেন তাতে এই বিস্ফোরণের নিন্দা করছেন এমন বোঝা যায়নি। তিনি শুধু সাবধান করেছিলেন যে, এই ঘটনাকে যেন শাসকদল নিজেদের দলীয় স্বার্থে না ব্যবহার করেন। যুক্তফ্রন্টের আর সব শরিক দলের বড় বড় নেতারা এক বাক্যে সমর্থন জানিয়েছেন এই বিস্ফোরণের পক্ষে। বিজেপি দলের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার সমর্থকেরা তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে মিষ্টি বিনিময় করেছে নিজেদের মধ্যে।

পরের দিন অবশ্য বামপন্থী শিবির থেকে সরকারিভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে বোমা বিস্ফোরণের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মতামত ব্যক্ত না করে কেন এই সময়টাকে বেছে নেওয়া হলো এই পরীক্ষার জন্য তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে দেশে বিদেশে কি প্রতিক্রিয়া হবে এর তা খতিয়ে দেখা হয়নি। তবে বিজ্ঞানীদের সাধুবাদ দেওয়া হয়েছে এই সাফল্যের জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে খুব সম্প্রতি সিপিআই (এম)-এর কোনো কোনো নেতা বা তাদের কোনো কোনো অংশ বোমা নিয়ে কিছু কিছু উক্তি করেছেন যাকে প্রয়োজনমতো বোমার বিরোধিতা বলে দাবি করতে পারেন, পরে যদি প্রয়োজন হয়। সিপিআই দলের অনেক রাজ্য নেতা অবশ্য বোমা-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রীয় নেতাদের তরফে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। এমন একটি দেশ নেই যে ভারতের সপক্ষে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ইরাক ছাড়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং জার্মানি শাস্তিস্বরূপ ভারতের ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারির কথা জানিয়েছে। অন্যান্য যে-সমস্ত দেশ এই আচরণের নিন্দা করে মতামত ব্যক্ত করেছে তার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, বাংলাদেশ, কানাডা, মালয়েশিয়া, চীন, সুইডেন, মেক্সিকো। পাকিস্তান সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো—'নিজেদের রক্ষা করার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা নেব।

এ-ব্যাপারে অন্য কারো নির্দেশ শুনব না।' অর্থাৎ তারাও অনুরূপ পরীক্ষা চালাবে জানিয়ে দিল।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সরকারের তরফে বেশ কিছু লক্ষণীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। যেমন তারা Fissile material cut-off treaty (FMCT) সম্পর্কে আলোচনায় বসতে রাজি আছে। CTBT নিয়ে ফের ভাবতে রাজি। NPT র স্বাক্ষরকারী না হলেও কয়েকটি ধারা সম্পর্কে তাদের সম্মতির কথা জানাতে প্রস্তুত ইত্যাদি।

একদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিরূপতা প্রশমনে এই সমস্ত ঘোষণা চলছিল। একই সঙ্গে চলছিল আরও দুটি বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তুতি। দুনিয়াভর সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তেরোই মে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ফের দুটো সাব-ক্রিটিকাল মাপের বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো ভারত সরকার। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রনেতা একযোগে রোষে ফেটে পড়ল। আর্থিক সাহায্য বন্ধের ঘোষণা করল জাপান, নরওয়ে, সুইডেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগেই অনুরূপ ঘোষণা করেছিল। ভারত যাতে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকে ঋণ না পায় তাও দেখবে বলে জানাল। কানাডা এতটাই ক্ষুণ্ণ যে, দিল্লী দূতাবাসের প্রতিনিধিকে দেশে ফিরে যেতে বলেছে। আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করল—'বোমা এবার ফাটাচ্ছি আমারাও'। এবং অবশেষে সতেরো দিনের ব্যবধানে আঠাশে মে পাকিস্তান সরকারও ছটি বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বকে জানিয়ে দিল তারাও প্রস্তুত ছিল ভারতের মতই। আর এদেশের মতো ওই দেশেও বোমা বিস্ফোরণে উল্লসিত জনতার কণ্ঠে আওয়াজ শোনা গেল—'দুশমন কো দিখানা তো থা'।

স্বভাবতই আর্থিক সাহায্যের ব্যাপারে একই রকম নিষেধাজ্ঞা জারি হলো পাকিস্তানের ওপরও। এখন দু-দেশেই হিসেব নিকেশ চলছে আর্থিক ব্যাপারে এই সমস্ত নিষেধাজ্ঞায় কার কতটুকু ক্ষতি। এদেশের চেয়ে পাকিস্তানের ওপরই এর প্রভাব বেশি পড়বে। পাকিস্তানের ঘাড়ে বিদেশী ঋণের বোঝা ছত্রিশ হাজার কোটি ডলার যা তাদের জিডিপি-র বাহাত্তর শতাংশ। সেখানে ভারতরে ঋণ হলো একানববই হাজার কোটি ডলার—যা এদের জিডিপি-র পঁচিশ শতাংশ। বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি মেটাতে এ বছর পাকিস্তানকে দেড় হাজার কোটি ডলার ঋণ নিতে হয়েছে আই এম এফের কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে ভারতকে এ-বছর সেই ঋণ নিতে হয়নি। বাইরের দেশ থেকে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ দু-দেশের ক্ষেত্রেই কমবে। সব দিক বিচারে আর্থিক সঙ্কটে পড়বে দুটি দেশ-ই। কেউ কম কেউ একটু বেশি, এই যা তফাৎ।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক মিশিলো কাকু-র দেওয়া একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা গেল যে, একবার নাকি কোনো এক সাংবাদিক রেগানকে প্রশ্ন করেছিল যে, এভাবে অস্ত্রের দৌড় চালিয়ে গেলে সোভিয়েত এবং মার্কিন দু-দেশের অর্থনীতিই তো ভেঙে পড়বে। উত্তরে রেগান নাকি বলেছিল—'অসম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে সোভিয়েত অর্থনীতিই ফাটবে আগে।' হ্যাঁ, 'ফাটবে' কথাটাই—ইংরেজিতে 'বার্স্ট' বলা হয়েছিল। এই হলো আজকের রাষ্ট্রপ্রধানদের দর্শন। ভারত পাকিস্তানের এই রেষারেষিতে দুদেশের অর্থনীতিই ফাটবে। কারো আগে কারো পরে। পরে যার ফাটবে সে এই আনন্দেই আছে। ❑

Science, Politics and the Bomb : Pokhran-II and After

T. Jayaraman

The unparalleled euphoria about Indian science and technology generated by the recent nuclear tests conducted by the Indian government has prevented a close examination of both the scientific claims and the political role of the atomic energy and defence reasearch establishments. Despite the sharp internal political divide that has emerged on the nuclear issue, with the Opposition parties directly questioning the motivation, timing and wisdom of the BJP Govt. in conducting the tests, the role and conduct of the atomic energy and defence research esatablishments has not yet been subjected to searching public or parliamentary criticism.

In this note we examine some aspects of both the high claims

মানুষের শুভবোধ একদিন জাগবে আর সেদিন সে ধ্বংসের পরিবর্তে শান্তি আর উন্নয়নের গান গাইবে — এই বিশ্বাসের প্রতি ভরসা রেখেই অধ্যাপক টি জয়ারমণ বোঝার চেষ্টা করেছেন পোখরান-এর সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের রাজনীতি আর বিজ্ঞানকে। বিস্ফোরণের মুখ্য হোতা রাজনৈতিক নেতা ও বিজ্ঞানীদের এ-ব্যাপারে যে মনোভাব কাজ করেছে এবং তাদের কাজকর্মও যুক্তি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন তিনি।

ড. টি. জয়ারমণ ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথেমেটিকাল সায়েন্সেস-এর সাথে যুক্ত। যে-প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেছিলেন গত 13 জুলাই ত্রিবান্দ্রমের এ কে জি সেন্টারে আয়োজিত সেমিনারে—তার সারাংশ এটি।

of scientific achievement and the political role of the DAE and the DRDO leadership in the run-up to the tests and later.

With regard to the claims of scientific achievement it is still unclear whether a true, two-stage thermo-nuclear device was exploded on May 11, 1998. Though the DAE has persisted with its claim that the thermo-nuclear test was indeed successful, the claim is surprisingly missing from the Prime Minister's *suo moto* statement to Parliament and received only a passing mention in the paper submitted to Parliament by the Prime Minister on the "Evolution of India's nuclear policy", in contrast to the highlighting of other claimed achievements. The question of whether India possesses true thermo-nuclear capability has obvious important policy consequences and this issue needs to be clarified.

Most recently, the claim by DAE scientists that India has actually developed the required capability for sub-critical testing has also been challenged, by a special correspondent of *Frontline* magazine in its June 17 issue.

Quite apart from these considerations, it is clear that the level of scientific achievement involved in these nuclear weapons tests is much less than that involved, for instance, in the successful running of power reactors or developing advanced technologies like fast breeder reactors. While the public and the media in India have always genuinely welcomed major milestones in the development of indigenous capabilities in science and technology, the disproportionate enthusiasm displayed after the tests is more due to ultranationalism and jingoism than anything else.

To turn to the political role played by the DAE and DRDO leadership, it is now clear that the leadership of both establishments have played an important pro-active role in the building up of pressure to conduct the tests.

The clearest evidence comes from the letter of former Prime Minister, H.D. Deve Gowda, to Prime Minister Vajpayee, written on 16 May, 1998. In this letter he clearly states that it was the scientists who had approached him in 1997, as they had approached the Narasimha Rao government in 1995, and sought permission to conduct

the tests. He adds that "I convinced the scientists that the time was not ripe..."

A section of senior DAE scientists have said, post-Pokhran-II, that they were happy to have been given a chance to prove their competence and capabilities. This is an unacceptably naive standpoint on the political role of science and scientists and evades the generally accepted view that scientists are, at least to some degree, responsible for the consequences of their work. Fifty years and more after Hiroshima such naivete speaks not of political innocence but of a backward understanding of science and its impact on society.

The more serious question however is the active advocacy of testing and weaponisation by a section of scientific leadership. Dr. R. Chidambaram, declared as early as March 3, in a press interview that tests were "necessary" and stated the readiness of the DAE to conduct them. The details of the interview make it clear that the DAE leadership was ready to bury the earlier Indian nuclear policy line to keeping the nuclear option open.

The technological necessity of proceeding with a certain line of research is a valid argument only when the end product of that research is deemed to be necessary, taking into account social and political considerations. The question of the technological "necessity" of conducting the tests is clearly sub-ordinate to the question of whether India should proceed down the road of nuclear weaponisation. The active advocacy of testing as "necessary" amounts in fact to advocacy of weaponisation and cannot be viewed as disinterested scientific advice.

The statements made by several leading figures of the atomic energy and defence research establishments subsequent to the tests have been both boastful and unacceptably jingoistic in character. Claims of India's security having been guaranteed and boastful claims of Indian technological superiority came a cropper when Pakistan tested its own nuclear weapons two weeks after the Indian tests. It is clear that this section of India's scientific leadership has contributed to dangerous illusions of strength and invincibility on the subject of national defence and security.

Among the most disturbing aspects of the post-Pokhran-II debate is the attempt to downplay the horrific aspect of nuclear weapons as weapons of mass destruction. Despite this being established as a scientific fact, statements are made, for instance, that nuclear weapons can be used in selfdefence. In a clear example of quackery in the nuclear field, a senior DAE scientist heading the Health, Safety and Environment group at the Bhaba Atomic Research Centre (BARC) claimed in a press interview (conducted before the tests) that India could survive a nuclear war. The advice given in the interview was either scientifically inaccurate or, where correct, completely incapable of being acted upon in the Indian context.

The current mood has made most leading scientists wary of speaking out critically. Fortunately some voices of dissent have emerged from within the scientific community on the issue of nuclear weapons. Though still a minority, these voices, we hope will eventually help turn science in India more firmly in the direction of peace and development.

❑❑❑

গোপনীয়তার এত বেড়া নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার রেগুলেটরি কমিশন সাধারণ মানুষকে নিউক্লিয়ার কাণ্ড-কারখানা সম্পর্কে অবহিত রাখতে আইনগতভাবে বাধ্য। তাই তেমন কোন কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলে পরিকল্পনা পর্ব থেকে শুরু করে তার বসানোর পর্বে, চালানোর পর্বে—চাইলে সমস্ত তথ্য দিতে হবে জনসাধারণকে। এমন কি কমিশনের মিটিং-এর সম্পূর্ণ বিবরণীও চাইলে জানা যাবে। এজন্য সেখানে গিয়ে হত্যে দিতে হবে না। টেলিফোন করেই জানা যাবে। এবং সেই টেলিফোনের জন্য কোনো কলচার্জ দিতে হবে না।

সূত্র : *Lawyers Collective*, July'97

পোখরান-সংলগ্ন গ্রামের মানুষ এবং জনকয় হিবাকুশা

পরমাণু বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা নাগাসাকির তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আক্রান্ত মানুষ শারীরিক পঙ্গুত্ব নিয়ে আজো বেঁচে আছেন কেউ কেউ। তাঁদের পরিচিতি আজ 'হিবাকুশা' বলে। তেমনই কয়েকজন এসেছিলেন ভারতে — সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের পরে পরেই। তাদের সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলির কথা স্মরণ করে এই মরণ খেলা বন্ধ করতে আবেদন জানিয়েছেন সবার কাছে। তাঁরা পোখরান এলাকার মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানাতে সেখানকার খেটোলাই গ্রামে গিয়েছিলেন। এই মর্মে প্রফুল্ল বিদোয়াই-এর দেওয়া যে সংবাদ Inter Press Release মারফৎ গত 24 জুন প্রচারিত হয়েছিল সেটি প্রকাশ করা হলো।

With a tiny population of 1,500, this village in the Thar desert is closest to the Pokhran Field-Firing Range where India detonated five nuclear devices last month.

At an enthusiastically attended meeting last week, villagers listened approvingly to Yasuhiko Taketa, 65, a visiting survivor of Hiroshima, 1945, and spoke out in anger at the effects of nuclear tests on their health and the environment. Khetolai felt the effects of both the 1974 (India's first nuclear test) and the latest tests.

At 12 noon on May 11, the army moved people out of their homes. "We were told that it was unsafe for us to stay indoors. There was going to be a powerful blast. So we were made to stand out in the hot sun for six hours," says Mahesh Bishnoi. "We couldn't leave the area ; we were a 'security risk'." The temperature in the shade then was 49 degrees.

Khetolai's people say they were exposed to radioactivity : they saw a huge balloon of dust rising from the site — a sign of radioactivity venting. According to

Nathuram Bishnoi, a village elder, there were 18 cancer deaths after the 1974 tests. High rates of bone cancer and leukaemia were corroborated by Dr. Raj Govind Sharma, a Jaipur-based oncologist, in *The Indian Journal of Cancer*. This warrants a serious health and radiation survey.

With 60 school teachers and 70 percent plus literacy, Khetolai is exceptional. People here know a lot about radiation. Many are Bishnois, an "environmentalist" caste which worships trees and animals.

They demand an independent radiation and health inquiry. They are not convinced that "there is no radioactivity". They know that there is natural radioactivity everywhere. What they want is verifiable data about dangerous isotopes such as plutonium-239, strontium-90 and cesium-137.

The meeting in Khetolai was organized by MIND (Movement in India for Nuclear Disarmament), a recently formed group, who hosted a three-member peace delegation from Gensuikin (Japan Congress Against A-and H-Bombs). Gensuikin opposes all nuclear weapons and tests, and also the U.S. nuclear umbrella for Japan. It held meetings in New Delhi, Pokhran, Khetoali, Jodhpur, Jaipur and Mumbai before going on to the Pakistani cities of Karachi and Islamabad.

The meeting in Khetolai unanimously resolved to express solidarity with hibakusha, call for an end to all nuclear testing, and demand that the government consult all citizens liable to be affected by its nuclear decisions. Khetolai's people have been fighting against the Range since 1965. Nathuram Bishnoi says : "Our struggle and the hibakusha's are the same".

Hibakusha Taketa struck a deep chord in his rural audience. A 12-years-old school boy in 1945, he survived by sheer accident : his school class was given a day of military duty on Aug. 6. He was at a suburban railway station, 7 km from the blast's hypocenter, when the bomb burst with a dazzling brightness that sent a flash of light through many victims' pupils. "It was like having a hundred magnesium coils burn a millimeter away from you," he said. The heat incinerated everything within a half-kilometer radius. Next came a shock wave in which tens of thousands were killed by sharps of shattered glass, tin sheets, and broken girders. Firestorms followed. People choked for want of oxygen.

Taketa recalls the fireball that rose. "It was like a grain of rice, but swelled into one huge sphere with flames like the tentacles of an octopus." Taketa only suffered mild injuries because he was far away. His 16 year old sister was less lucky. The blast hit her. She reached home the next day. "Her clothes were stuck to the skin. We had to use scissors to separate them. But it was too late. She died in agony. We could do nothing..."

Twenty eight of Taketa's classmates died. As did 183 students of the next class. A third of Hiroshima's 400,000 population perished. Over 92 percent of its buildings were razed. "We realized that this is not just a big bomb. It is another weapon altogether — meant to creat hell on earth," says Taketa. Worse was to follow — radiation poisoning and genetic deformities. These continue to take their toll to this day; days before Taketa reached India, his second sister died of long-gestation stomach cancer. Three generations later, we hibakusha don't know when death will strike us."

Says Mariko Kitano, a third-generation victim herself : "I am the grand daugheter of a hibakusha and I bear the scars of that living hell in my deformed feet, one eye that cannot see and a left hand that only lies motionless at my side ... thanks to the miracle of nuclear energy ... I am sickened to my stomach at the sight of ... jubilant faces celebrating .. nuclear tests." Those images of people jumping with joy at India's nuclear tests that were beamed around the world were from places far away from Khetolai and Pokharan. Here the people are dismayed, worried and angry.

Dismayed, because they do not understand how sitting on a N-bomb can produce security. Worried, at the effects of nuclear tests on their health and the environment. And angry, because they were exposed to high risks without being told about them.

In villages and cities, the Japanese delegation was asked, "Would the U.S. have attacked Japan with nuclear bombs if Japan had an atomic weapon?" Their answer was loud and clear. "Yes. If Japan had the delivery system, it would have dropped a bomb on the U.S. And the U.S. would definitely have attacked/retaliated."

Says Taketa, "We must get rid of nuclear weapons altogether. So long as they are around, there will always be the danger of their use — to devastating effect." ❑

ভারতের পরমাণু প্রকল্প : কথায় ও কাজে

শুভো মুখোপাধ্যায়

পরমাণু শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদের সব আজগুবি ধারণা অধিকাংশ বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদের মাথায় কাজ করতে থাকে। তার ফলে একদিকে তারা প্রকাশ্যে এক ধরণের কথার ফুলঝুরি ছড়ান — অন্যদিকে কাজে দেখান তার উল্টোটা — মানে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা তখন তাঁরা। এই স্ববিরোধিতা সহজেই ধরে ফেলা যায় তাদের কথা আর কাজের হিসেবের খতিয়ান ঘাঁটলে।

ভারতের নিউক্লিয় নীতি কি ছিল? এর কি কোনো বিবর্তন ঘটেছে? কত ধরণের সরকার কেন্দ্রে এল-গেল, এর ফলে কি আমাদের নিউক্লিয় নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে? নিউক্লিয় নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সহজলভ্য নয়। এমনকি পার্লামেন্টেও নিউক্লিয় বিষয় নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার পরিমাণ কম। নিউক্লিয় বিষয় নিয়ে বির্তকের ক্ষেত্রে সরকার-পক্ষ এবং সরকার-বিরোধী-পক্ষ উভয়েই কেমন যেন একমত হয়ে পড়েন। এটা যেমন সাম্প্রতিক কালে সত্যি, অতীতেও সত্যি ছিল। নিউক্লিয় শক্তির সঙ্গে স্বাদেশিকতা জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মিশ খেয়ে পুরো ব্যাপারটা অনেকটা ঘোলাটেও হয়ে পড়েছে।

আমরা তাই চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন সময়ে, লোকসভা, কূটনৈতিক ভোজসভা এবং অন্যান্য সূত্রে রাষ্ট্রনায়কদের যে সব টুকরো টুকরো বক্তব্য বই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেসব থেকে সরকারি মতিগতি কিভাবে বদলেছে দেখানোর। দুটো প্রশ্ন আছে এখানে।

এক, ভারতের নিউক্লিয় নীতিটি স্ববিরোধী কিনা।

দুই, ভারতের নিউক্লিয় বোমা বানানোর পরিকল্পনা ছিল কি না।

ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায় দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পর্বে শান্তির চাহিদা এতই জোরদার ছিল যে সমস্ত কিছুকেই শান্তির উদ্দেশ্যে

পরিচালনার একটি বিশ্বব্যাপী প্রবণতা ছিল। এর হাত ধরে আসে 'শান্তির জন্য পরমাণু'। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইওরোপ, বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হিরোশিমা-নাগাসাকি আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীদের বিবেক — এমনই এক পটভূমিতে নিউক্লিয় গবেষণায় রত বিজ্ঞানীরা গবেষণার মানবিক প্রতিফলন নিয়ে পীড়িত ছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট, অর্থনৈতিক সংকট এবং দ্রুত পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা। এই পরিপ্রেক্ষিতে "শান্তির জন্য পরমাণু" গবেষণার জন্ম হয়। এযাবৎকাল পরমাণু গবেষণার কল্যাণকর দিক বলতে তার যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহার ছিল তার বাইরে এই কল্যাণকর দিক প্রসারিত করার এক প্রবল তাড়না বিজ্ঞানীদের আকুল করে তোলে।

আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ব্রিটিশ আমলে যে পরিকল্পনা সংস্থা জবাহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে হয়েছিল তাতে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ছিলেন একজন উৎসাহী। বিজ্ঞানী সাহা বরাবরই কর্তৃপক্ষ বিরোধী মানুষ ছিলেন। পরাধীন ভারতে যেমন, 1947-পরবর্তী ভারতেও তিনি দেশ-শাসকদের কাছে কল্কে পান নি। দেশের লোক আমলা-বিজ্ঞানী ভাবা-কে ভারতের পরমাণু গবেষণার পথিকৃৎ হিসেবে জানে, অথচ কি বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, কি নিউক্লিয় নীতি প্রণয়নে, সব ক্ষেত্রেই সাহা ভাবা-র বহু আগেই অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। সারা পৃথিবীতে নিউক্লিয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে সাহার অবদান স্বীকৃত, এশিয়ার প্রথম নিউক্লিয় ত্বরণযন্ত্র এবং প্রথম নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যার মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। নেহরুর আমলে তিনি ভারতের পরমাণু মন্ত্রক গঠনের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং গোপনীয়তায় ভরপুর, আমলা-নির্ভর দায়বদ্ধতাহীন, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বদলে, খোলামেলা, বিজ্ঞানী-নির্ভর, দায়বদ্ধ, বিকল্প এক সাংগঠনিক কাঠামোর প্রস্তাব দেন। নেহরু সরকার, ভাবা-র প্রস্তাব এবং সাহা-র প্রস্তাবের দ্বন্দ্বের মধ্যে বেশ কিছুদিন কাটান। এর মধ্যেই সাহা নিউক্লিয় আইসোটোপ পৃথকীকরণ করে তা চিকিৎসার কাজে লাগাতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু নেহরু সরকার এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বের সমাধান করেন আর একটি সম্পূর্ণ তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ভাবা-র পেছনে পার্শী ব্যবসায়ীকুল তাদের যাবতীয় ঐশ্বর্য নিয়ে এগিয়ে আসেন — তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ দেশের, দশের এবং বিজ্ঞানের স্বার্থ ছাপিয়ে ওঠে। নেহরু সরকার ভাবা-র (অর্থাৎ পার্শী তথা টাটা গোষ্ঠীর) মদতে, ম্যানহাট্টন প্রজেক্টের আদলে পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র এবং পরমাণু শক্তি কমিশন গঠন করে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার যাবতীয় উপাদান (যেমন রেডিও আইসোটোপ, নিউক্লিয় ডিটেক্টর, গবেষণালভ্য মৌলিক তথ্য, যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ইত্যাদি) একটি ছাতার তলায় আনেন। এর ফলে ভারতের নিউক্লিয় গবেষণা একটি গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়। এই গোষ্ঠীর বাইরে যে সব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, দক্ষ গবেষক রয়ে গেলেন তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার কোনো রাস্তা রইল না। শুধু তাই নয়, নিউক্লিয় গবেষণা সংক্রান্ত পঠন-পাঠন, তার প্রকৌশলগত দিকও নিয়ন্ত্রণ শুরু করল পরবর্তীকালের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র।

কানপুর আই আই টি, ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বাইরে প্রথম নিউক্লিয় রিঅ্যাক্টর ডিজাইনে এম-টেক্ পাঠক্রম চালু করে। প্রথম দু-বছর যে পনেরো জন ছাত্র শতকরা 99% নম্বর পেয়ে পাশ করে তাদের চাকরি ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে হয়নি। যুক্তি ছিল, এই ছাত্ররা ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের শিক্ষাপ্রাপ্ত নয়! ফলে এই পাঠক্রমটি জনপ্রিয়তা হারায় এবং তা পরবর্তী বছরে তুলে নেওয়া হয়। ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র যে কেবল গবেষণার ওপরেই খবরদারী করছে তাই নয়, এই বিষয়ের শিক্ষার ওপর এমন হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত ব্রিটিশ আমলেও দেখা যায় নি।

এমনই এক পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু সরকার তার নিউক্লিয় শক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে। এমন এক দমচাপা অবস্থায়, চরম গোপনীয়তার মধ্যে এক একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিই-বা আশা করা যায়! এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পার্শী ব্যবসায়ীকুলের ব্যবসায়িক স্বার্থ। যে গোপনীয়তার অজুহাতে দেশের দক্ষ বিজ্ঞানীদের এই প্রতিষ্ঠানের আওতার বাইরে রাখা হলো, সেই পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন স্থায়ী সদস্য কিন্তু টাটা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি! সন্দেহ নেই, সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ সংস্থায় ব্যবসায়িক প্রতিনিধির উপস্থিতি বিজ্ঞানের পরিবর্তে মুনাফাকেই অগ্রাধিকার দেবে।

নেহরু-র নিউক্লিয় নীতির মধ্যে 'শান্তির জন্যে পরমাণু' এই ঘোষণায়ও স্ববিরোধিতা ছিল কম! এছাড়া সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত চাপ ছিলই। অন্যদিকে, তখনকার যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী বাতাবরণ ছিল তাতে শান্তির বদলে অন্য কিছু করা কঠিনও ছিল। যদিও নেহরু-র ঘোষণায় স্ববিরোধিতা প্রায় ছিল না, কিন্তু ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পর আমলা বিজ্ঞানীদের উৎসাহে নিউক্লিয় সমরায়ণের পথ প্রশস্ত হয়। এবং পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নিউক্লিয় বোমা বানানোর পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। এর পরেই ঘটে চীনের পরমাণু বোমার পরীক্ষা এবং এদেশেও শুরু হয় গোপনে, চোরাই পথে বোমা বানানোর উপযোগী উপাদান, প্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ সংগ্রহের প্রয়াস। টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন সব সংবাদ থেকে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান সরকারের মতোই ভারত সরকারও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এভাবে সংগ্রহ করেছে অনেক কিছু। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা এবং ক্ষেপণাস্ত্রের গবেষণা। আজকে ভারতের এবং পাকিস্তানের হাতে যে শুধু নিউক্লিয় বোমা (5 কিলোটনের কম থেকে কিলোটনের বহুগুণ ক্ষমতাসম্পন্ন) আছে তাই নয়, সেই বোমা বহন করার মতন উপযুক্ত বিমান বহর, জাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী ট্যাঙ্ক এবং স্থলভাগ থেকে উৎক্ষেপণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোও রয়েছে।

পরমাণু প্রকল্প : কথায়

1957, 24 জুলাই, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু : "আমরা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, পরমাণু বোমা বানানোর কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই ; যদি সেই

ক্ষমতা আমাদের থাকেও তো তা ধ্বংসের কাজে লাগাব না। আমি সুনিশ্চিত যে, আমি যখন এ কথা বলছি, তখন এই সভার প্রত্যেক সদস্যের হয়ে সে কথা বলছি। আমি আশা করি, এটাই হবে ভবিষ্যতের সব সরকারের নীতি।"

1960, 10 অগাস্ট, লোকসভায় শ্রীনেহরু : "আমাদের দিক থেকে বলতে পারি আমরা পরমাণু-বোমা না বানানোর ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে এ ব্যাপারে একইভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, এই শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের না পেছিয়ে পড়তে হয় সেটাও দেখব।"

1965, অক্টোবর, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী : "পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত চীনের দিক থেকে আক্রমণের ভয় অব্যহত থাকা সত্ত্বেও সরকার পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের পথে না গিয়ে এই অস্ত্র যাতে নির্মূল করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকছে।"

1968, 24 এপ্রিল, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী : "আমরা মনে করি না পারমাণবিক অস্ত্র প্রচলিত অস্ত্রের বিকল্প হতে পারে। আমাদের সামনে সে পথ খোলা থাকলেও এটা তো নিছক গুটিকয়েক বোমা বানানো নয়, বোমা এবং বোমা বহনকারী মিসাইল ইত্যাদি নিয়ে রীতিমতো একটা অস্ত্র-দৌড়ের পাল্লা। আমি মনে করি না, এই রাস্তা আমাদের জাতীয় সুরক্ষার সহায়ক হবে। বরং একটা আর্থিক বোঝা হিসেবে আমাদের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষাকে বিঘ্নিত করবে।"

1970, 5 মার্চ, লোকসভায় শ্রীমতী গান্ধী : "আমাদের সরকার বিশ্বাস করে যে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং মহাকাশ গবেষণা প্রকল্পে আমাদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সামর্থকে বিস্তৃত করার বর্তমান সরকারি নীতি আমাদের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্যই নেওয়া।"

1974, 18 মে-র পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ শান্তির কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই বলে দাবী করা হয়।

1974, 1 জুন, শ্রীমতী গান্ধী কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে লিখছেন : "ভারত পারমাণবিক শক্তিকে শান্তির কাজে লাগানোর নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর কোনো উদ্দেশ্য আমাদের নেই। পারমাণবিক শক্তির সামরিক ব্যবহার যা মানুষের পক্ষে আতঙ্কের, এতদিন তার বিরোধিতা করে এসেছে ভারত এবং আগামীদিনেও তা করে যাবে।"

1979, 23 অক্টোবর, *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায় উল্লিখিত পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেদব্রত বড়ুয়ার উক্তি : "প্রতিটি দেশের, তা পরমাণু অস্ত্রধর হোক বা নাই হোক, তাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে পরমাণু অস্ত্রের সার্বিক বিলোপসাধনের ওপর। এই নিরস্ত্রীকরণ সার্বিক না হলে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।" এই উক্তিটি করা হয়েছে যখন পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তির জন্য বছর তিনেক ধরে আলোচনার শেষেও পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশগুলো

কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না সেই সময়ে। এখানে উল্লেখ্য, আলোচনার পরেই বিশ্বজুড়ে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

1983, 27 সেপ্টেম্বর, *আজকাল* পত্রিকা। রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী : "পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশগুলির উচিত বিশ্বের সকল দেশকে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া যে, কোনো অবস্থাতেই তারা এই অস্ত্র ব্যবহার করবে না। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঐ দেশগুলির উচিত অবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে বসা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও পরীক্ষা বন্ধ করা। একমাত্র সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণই স্থায়ী এবং প্রকৃত শান্তি স্থাপন করতে পারে।"

1987, 14 জানুয়ারি, *দ্য টেলিগ্রাফে* প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীর উক্তি : "নতুন নতুন সমরসম্ভার বানিয়ে নিরাপত্তা রক্ষা করার নীতি বাস্তবানুগ নয়। এই রাস্তা আসলে কানাগলি। অন্য বাস্তবানুগ রাস্তা হলো সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ। এই রাস্তায় চললেই ভবিষ্যৎ ভয়মুক্ত হবে।"

1988, 25 জুলাই, *দ্য টেলিগ্রাফে* শ্রীরাজীব গান্ধীর উক্তি : "আমরা বাধ্য না হলে কখনই পরমাণবিক অস্ত্র বানাব না। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশ সহ পৃথিবীর সব দেশের সাথে একযোগে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি করতে আগ্রহী।"

1989, 23 মে, *দ্য টেলিগ্রাফে* প্রকাশিত শ্রীরাজীব গান্ধীর বক্তব্য : "ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পক্ষে 'অগ্নি' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অগ্নি মোটেই পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র নয়। অগ্নি সাধারণ অস্ত্র যা দক্ষতার সাথে নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করতে পারবে।"

1990, 28 জানুয়ারি *দ্য টেলিগ্রাফ*-এর খবর : ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর ড. রাজা রামান্নাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী করায় আনন্দ প্রকাশ করে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের মতে " ড. রামান্নাকে যদি পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হয় তবে তিনি পরমাণু অস্ত্রের পথই পছন্দ করবেন। এটাই তাঁর স্বাভাবিক পছন্দ।"

পরমাণু প্রকল্প : কাজে

1974, 18 মে, রাজস্থানের পোখরান মরু অঞ্চলে প্রথম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় ভারত সরকার।

1983, 25 এপ্রিল, *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী আর ভেঙ্কটরমনের উক্তি : "প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ব্যক্তি মালিকানার কারখানা থেকে কেনা হবে। এর ফলে 'হঠাৎ প্রয়োজন হলে' প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রসামগ্রী দ্রুত এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হবে।

1983, 18 নভেম্বর, *দ্য স্টেটসম্যান* খবর দিচ্ছে : ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন ও

অস্ট্রিয়া যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী। যে যে বিষয়ে এই সহযোগিতা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে তা হলো অতি আধুনিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, হাল্‌কা যুদ্ধ বিমান, ট্যাঙ্ক, বন্দুক রাডার। এছাড়া ভবিষ্যতের জন্য অত্যাধুনিক নক্‌শার ভারী যুদ্ধ বিমান, বিমান পরিবহণযোগ্য সতর্কীকরণ যন্ত্রপাতি ; ইলেকট্রনিক পর্যবেক্ষণ ও প্রতি-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (counter-measure equipments) এবং নৌ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি। ব্রিটেন দেবে সী-হারিয়ার জাম্প জেট বিমান এবং ঈগল বিমান। এছাড়া এই ঈগল বিমানের সঙ্গে স্থলভাগ থেকে স্থল-ভাগে নিক্ষেপযোগ্য মিসাইলও থাকবে। সুইডেন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্তকরার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাদি সরবরাহ করবে।

1987, 28 অগাস্ট, *দ্য টেলিগ্রাফ* খবর দিচ্ছে : পার্লামেন্টে অ্যাটমিক এনার্জি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল কোনো বিরোধিতা ছাড়াই গৃহীত হয়। এই বিলের ফলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন তৈরি হলো। পার্লামেন্টে বিতর্কের সময় তেলগু দেশমের বি বি রামাইয়া, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির হান্নান মোল্লা, কংগ্রেস (আই) এর ফুলরেণু গুহ এবং জনতা দলের সৈয়দ সাহাবুদ্দিন এই বিলকে স্বাগত জানায়।

1988, 16 জুলাই, *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকার সংবাদ : একটি পশ্চিম জার্মান সংস্থা বেআইনীভাবে কয়েকশো টন ভারী জল চীন, নরওয়ে ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতে পাচার করেছে। এই ঘটনা ঘটেছে 1980 থেকে 1985-র মধ্যে। ডুসেলডর্ফ বাসেন আলফ্রেড হেম্‌পেল চীন থেকে বেশ কয়েকশো টন ভারী জল আমদানি করে তা দুবাই হয়ে ভারতে পাচার করে। 1983 সালে নরওয়েতে তৈরি 20.6 টন ভারী জল পাচার হয়ে ভারতে পৌছেছে। এছাড়াও ডিসেম্বর 1983 সালে নরওয়ে থেকে দুবাই হয়ে 15 টন ভারী জল ভারতে আসে। এর আগে 1982 সালে নরওয়ে থেকে গোপনে দুবাই হয়ে 5.6 টন ভারী জল ভারতে চালান আসে।

1989, 20 মে, *দ্য টেলিগ্রাফে* প্রকাশ : মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা মনে করে যে, ভারত হাইড্রোজেন বোমা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে সব ইঙ্গিত দেখে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে তা হলো : (ক) ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে লিথিয়াম-ছয় কে উচ্চপর্যায়ে বিশুদ্ধিকরণ করা হয়েছে। (খ) লিথিয়াম আইসোটোপ আলাদা করা হচ্ছে। (গ) ভারতে ট্রাইটিয়াম তৈরি হচ্ছে। (ঘ) পশ্চিম জার্মানি থেকে ভারত বেআইনীভাবে ফিউসন বিক্রিয়া বিবর্ধিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বেরিলিয়াম হাতিয়ে নিয়েছে। এই বেরিলিয়াম জার্মানির ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং এই বেরিলিয়াম ভারতে রপ্তানি করার প্রয়োজনীয় অনুমতি জার্মান সংস্থাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নেয়নি। (ঙ) 1984 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 95 কেজি বেরিলিয়াম জার্মানীতে পাঠিয়েছিলো যার পুরোটাই সম্ভবতঃ ভারতে পাচার হয়ে এসেছে।

1989, 23 মে, *দ্য টেলিগ্রাফ The Defence and Foreign Affair Weekly* উদ্ধৃত করে জানাচ্ছে :

পাকিস্তানী বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয় বোমা ফাটানোর জন্য ডেটোনেটারের নক্‌শাকে অনেক নিঁখুত করে ফেলেছে। এছাড়াও পাকিস্তান তার খাতুয়ার নিউক্লিয় চুল্লীতে অনেক খাঁটি ইউরেনিয়াম তৈরি করতে শুরু করেছে। পাকিস্তান বোমার জন্য এমন এক আধার তৈরি করেছে যাতে একে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন বিমানে বহন করা যাবে। এই আধারে ভরা বোমা নিয়ে পাকিস্তানের F-16 বিমানও উড়তে পারবে আকাশে।

1989, 23 মে, *দ্য টেলিগ্রাফ জানাচ্ছে নিউক্লিয়ার ফুয়েল জার্নাল* উদ্ধৃত করে : পাকিস্তানের আণবিক শক্তি কমিশন নিউক্লিয় বোমা নিয়ে জোরদার গবেষণা চালাচ্ছে। 1987 সালে জার্মান সংস্থা NTG Nukleartechnik GmBH পাকিস্তানকে একটি যন্ত্র সরবরাহ করে যার সাহায্যে পাকিস্তান ট্রাইটিয়ামকে আরও খাঁটি করছে। এছাড়াও একে গ্যাস ভাণ্ডারজাত করার কলাকৌশলও তার আয়ত্বে। পাকিস্তানে লিথিয়াম-ছয় ধাতুতে ধাক্কা দিয়ে ট্রাইটিয়াম তৈরির পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতে শতকরা 98 ভাগ খাঁটি ট্রাইটিয়াম পাকিস্তান পাচ্ছে। মাত্র 4-5 গ্রাম ট্রাইটিয়াম নিউক্লিয় ফিসন বোমার জন্য যথেষ্ট।

1989, 30 মে, *দ্য টেলিগ্রাফ* জানাচ্ছে : যাদবরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত ও তপন ঘোষালের নেতৃত্বে 'অগ্নি' মিসাইল-এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর গবেষণালব্ধ যন্ত্র মিসাইলে স্থাপন করা হয়েছে। তাঁদের মতে, এই সাফল্য অন্য দেশে হলে, বিভাগে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত।

❑❑❑

মার্টেন্স ক্লজ

1907 সালে, Hague Convention Concerning the Laws and Customs of War on Land বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবের ভূমিকায় বলা হয়েছে :

"... until a more complete code of the laws of war can be drawn up, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not covered by the rules adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and governance of the principles of the law of nations, derived from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and from the dictates of the public conscience."

এই অংশটিকে মার্টেন্স ক্লজ বলে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও এই মার্টেন্স ক্লজ ('de Martens clause') মানবিকতার ওপর গুরুত্ব দেয়।

ভারত-পাকিস্তানের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সম্পর্কে

পাকিস্তানের পদার্থবিজ্ঞানী পারভেজ হুডভয়

বন্ধুগণ,

ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের দ্বারা আয়োজিত আজকের এই সভা সত্যিই অদ্বিতীয় । এই রকম সভা আর কোথাও হচ্ছে বলে আমার জানা নেই, যদিও আমার আশা যে ভবিষ্যতে এই ধরণের বহু সভা অনুষ্ঠিত হবে। গতকালকের আকস্মিক, প্রায় অবিশ্বাস্য ও বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা এবং সেই ঘটনা-প্রসূত ক্ষোভ আজ আমাদের একত্রিত করেছে। আমরা একত্রিতভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই ঘৃণা ও ধ্বংসের এই সব পূজারীদের, মানুষ মারার অস্ত্র নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের এবং সেই সব 'মহানুভব'দের যারা মনে করে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করার কৃতকৌশল আয়ত্ব করাটাই ক্ষমতা বিস্তারের একমাত্র পথ। পারস্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাসের যে আবহাওয়া দুই দেশের সরকার তৈরি করেছে, যাকে লালন করা হচ্ছে গণমাধ্যম ও স্কুল পাঠ্য শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে এবং গত কয়েক দশক ধরে যে আদর্শকে গজাল মেরে ঢোকানো হয়েছে দুই দেশের শিশুদের মস্তিষ্কে, আজ আমরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই।

গতকাল ভারতের পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের মানুষ এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের আরও অনেক কাছাকাছি এসে পড়ল। অনুমান করা শক্ত নয় যে এই বিস্ফোরণের কম্পন আগামী বহু বছর ধরে আমাদের আলোড়িত করবে। অথচ আজ এই

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইন্‌স্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)তে গত 12 মে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল সাম্প্রতিক কালের এই বিস্ফোরণগুলোর আগেই। সে সভার আলোচ্য বিষয় ছিল : ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। আয়োজক : Alliance for Secular and Democratic South Asia, Pakistan Students Society at MIT এবং MIT Programme in Science. আলোচনাসভায় বক্তা ছিলেন ড. পারভেজ হুডভয়। ড. হুডভয়, ইসলামাবাদের কায়েদ-ই-আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং বর্তমানে আমেরিকার মেরিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক। ড. হুডভয়ের বক্তৃতার সারাংশটি প্রকাশ হলো এখানে। ই-মেলে এদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা asur @ mit. edu। অনুবাদক তপন চক্রবর্তী।

ধ্বংসক্ষমতা নিয়ে চারদিকে চলেছে এক নারকীয় বিজয় উল্লাস। কিন্তু এই ঘটনাই ভবিষ্যতে আমাদের গভীরতম অনুশোচনার বিষয় হতে বাধ্য। দিল্লী আজ বিজয়োৎসবে মত্ত। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধান খুশু ভাই ঠাক্‌রে ঘোষণা করেছেন "অচিরেই আমরা পাকিস্তানকে নতজানু হতে বাধ্য করব।" আর ঠিক একমাস আগে এই উন্মত্ততা দেখা গিয়েছিল পাকিস্তানে — ঘাউড়ি ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণের পরে। উন্মত্ত জনতা খাটুয়া পরীক্ষাগারকে পরিণত করেছিল তীর্থস্থানে এবং পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী গৌহর আইয়ুব দম্ভভরে ঘোষণা করেছিলেন "মিসাইল উৎক্ষেপণ কারিগরিতে আমরা ভারতের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছি।" দুপক্ষের মূঢ়তার এর চেয়ে ভাল উদাহরণ দুনিয়া জুড়ে খুঁজে পাওয়া ভার।

আমার বক্তৃতার বাকি অংশে, পাঁচটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আলোচনা করব।

প্রথম প্রশ্নটা হলো — পারমাণবিক বিস্ফোরণ দিয়ে কি ভারত সত্যিই পাকিস্তানকে নতজানু হতে বাধ্য করতে পারবে?

প্রশ্নের উত্তরটা হবে "হ্যাঁ" যদি পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ, ঠাক্‌রে ও তার বিজেপি গোষ্ঠী ঠিক যেভাবে চাইছে সেইভাবেই প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকে। আর উত্তরটা হবে "না" যদি পাকিস্তান এই সংকট মূহূর্তে সাবধানতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারে। যদি পাকিস্তান এই প্ররোচনায় পা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করে, তবে অন্যান্য দেশের নিষেধাজ্ঞায় বিপর্যস্ত হবে পাকিস্তানের অর্থনীতি এবং তা হবে বিজেপি-র মুসলিম বিরোধী গোষ্ঠীর পরম উপভোগ্য! এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারী হবে ভারতের ওপরেও। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞার ভার ভারতের পক্ষে যত কষ্টকরই হোক, ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাতে একেবারে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা নয়, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার চাপে তার বিদেশী সাহায্যনির্ভর, ভঙ্গুর অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙে পড়বে এবং অবস্থাটা সম্ভবত বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার চেয়েও খারাপ দাঁড়াবে। যদি পাকিস্তান ভারতের বোমার বিরুদ্ধে বোমা, মিসাইলের বিরুদ্ধে মিসাইল এবং ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক বানানোর প্রতিযোগিতায় নামতে চায়, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হাল হবে সিমেন্টের মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাঁচের ফুলদানির মতো।

গত পনেরো বছর ধরে পাকিস্তানের যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠনগুলো একথা বলে আসছে যে, পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামা ধৃষ্টতামাত্র, কারণ এ-প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান কোনোদিনই জিততে পারবে না। আজ এ-কথার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বারংবার বলেছি যে, পাকিস্তানের মূল সমস্যা তার অভ্যন্তরে। স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার পাশাপাশি ভোগ্যপণ্যের বিপুল চাহিদা, ধর্মীয় ও জাতিগত নানা সংঘাত, ভেঙে পড়া শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি হলো পাকিস্তানের মূল সমস্যা। তাই খানিকটা বিস্মিত এবং একই সাথে আনন্দিত হয়েছিলাম সপ্তাহ খানেক আগে, যখন জেনারেল জাহাঙ্গীর কারামৎ (যিনি কিনা পাকিস্তানের সব চেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের একজন) এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় সমস্যা ভারত

নয়, সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি। আশ্চর্যের হলো যে, প্রতিষ্ঠান বিরোধীদের বহুকথিত 'আপ্তবাক্য' আজ প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের মুখ দিয়ে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই উপলব্ধি কি ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের আঘাত সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে? যদি পারে, তাহলে আশা এখনও আছে।

আলোচনায় আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভারত কি আরেকটি 'সুপার পাওয়ার'? পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাফল্য ও তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করার মধ্য দিয়ে কি ভারতের 'সুপার পাওয়ার' পর্যায়ে উন্নয়ন সুনিশ্চিত হচ্ছে?

যে দেশে চল্লিশ কোটি লোক অভুক্ত ও জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যে দেশের মুম্বাই বা কলকাতার মতো বড় বড় শহরে ফুটপাথ বাসিন্দার সংখ্যা কয়েক লক্ষ, সে দেশকে 'সুপার পাওয়ার' আখ্যা দেওয়ার মতো অবাস্তব ও অলীক কল্পনা আর কি হতে পারে? তিনটে কেন তিনশোটা পারমাণবিক বিস্ফোরণও ভারতকে সুপার পাওয়ার স্তরে নিয়ে যেতে পারবে না। যথারীতি বিস্ফোরণের জন্য ভারত সরকার জাতীয় প্রতিরক্ষার দোহাই পেড়েছে। কিন্তু সুরক্ষিত করার বদলে এই বিস্ফোরণ ভারতের নিরাপত্তাকে আরও বিঘ্নিত করে তুলেছে। কারণ প্রথমত, চীন এই বিস্ফোরণকে ভাল চোখে দেখবে না। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান এই ঘটনাকে তাদের বিপদ সংকেত বলে ধরে নেবে। পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর পরিকল্পনা বহুদিনের এবং সম্ভবত কয়েকটি পারমাণবিক অস্ত্র সে ইতিমধ্যেই বানিয়েও ফেলেছে। যদি অস্ত্র নাও বানিয়ে থাকে এরপর সে বানাবেই। আগামী কদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর সম্ভবনাও প্রবল। কিন্তু বিস্ফোরণ হোক বা না হোক আগামী কয়েকবছর ধরে পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এতে আর যাই হোক ভারতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে না।

এরমধ্যে আরও লক্ষণীয় বিষয়, ভারতীয় শাসকবর্গের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যারা একথা বিশ্বাসই করেন না যে, পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারে। পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনা বিষয়ে (সংযত থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে) এঁদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই (যার মধ্যে আমিও একজন) পাকিস্তানের অক্ষমতা সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় দেখে বিস্মিত হয়েছেন। অসংখ্য এরকম উদাহরণ আছে যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের অনেকেই এই আত্মপ্রবঞ্চনামূলক ধারণা পোষণ করেন। যতদিন না পর্যন্ত বাইরের একাধিক সূত্র থেকে এটা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ততদিন এঁদের অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন যে, ঘাউড়ি মিসাইল সত্যিই সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক হবে যদি ভারতীয়রা এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন যে, বিস্ফোরণ ঘটানোর ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে ওঠা সম্ভব হবে না।

আমার তৃতীয় প্রশ্ন হলো ভারতের কি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার কোনো অধিকার আছে? বিশেষত যখন এটা জানা আছে যে ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই পাঁচ পাঁচটি

পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ আছে?

এর উত্তর — সরাসরিভাবে, "না"। সর্বতোভাবে ক্ষতিকর, গণহত্যাকারী এই অস্ত্র নীতিগতভাবে কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। কোনো দেশের সরকারের অধিকার নেই এই অস্ত্র বানাবার। প্রতিটি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব তাদের দেশের সরকারকে এই অস্ত্র বানানোর প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স এবং এখন ভারতকে সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র অবিলম্বে নষ্ট করে ফেলার জন্য বাধ্য করা উচিত। ইজরায়েল ও পাকিস্তানকেও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা উচিত।

একথা বলার পরও আবার বলছি, অন্য পাঁচটা পারমাণবিক শক্তিধর দেশের তুলনায় এই অস্ত্র তৈরি করার অধিকার অনেক কম ভারত ও পাকিস্তানের। কারণ, পরস্পরের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করার সম্ভবনা এক্ষেত্রে অনেক বেশি। যে-ঘটনায় দু-দেশের কয়েক লক্ষ মানুষের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভবনা আছে তাকে কেন্দ্র করে ঠিক-বেঠিকের অলস কেতাবী বির্তক চালিয়ে যাওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হয় না। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি ভারতীয় ও পাকিস্তানীর উচিত এই উপমহাদেশকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত রাখার দাবিতে সোচ্চার হওয়া।

আমার চতুর্থ প্রশ্নটা এরকম — ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক যুদ্ধ কি আসলে রটনাকারীদের কল্পনামাত্র?

যতক্ষণ না সত্যি সত্যি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হচ্ছে ততক্ষণ এ প্রশ্নের শেষ উত্তর দেওয়া মুশকিল। আর পারমাণবিক যুদ্ধ একবার শুরু হয়ে গেলে এ প্রশ্নের আলোচনা একেবারেই অর্থহীন। কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি দেখেছি বহু লোকই মনে করেন যে, এই উপমহাদেশে পারমাণবিক যুদ্ধের বাস্তব সম্ভাবনা অত্যন্ত সুদূর পরাহত। আমরা মনে হয়, এইসব মানুষরা মুখের স্বর্গে বাস করছেন।

এ-কথা আমিও স্বীকার করছি যে, ভারত বা পাকিস্তান সরকারের সামরিক প্রয়োজনে, পরিকল্পনা মাফিক পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম। কিন্তু হিসেবনিকেশের সামান্য গণ্ডগোল অথবা বিশুদ্ধ দুর্ঘটনাজনিত কারণে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ শুরু হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এবং একবার শুরু হলে তা নিজস্ব নিয়মে উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। এ প্রসঙ্গে একবার ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক্। 1965 সালে মেজর জেনারেল আয়ুব খাঁ সঠিক হিসেব করে উঠতে পারেন নি কাশ্মীরে ভারত শাসন বিরোধী বিদ্রোহে উশ্কানি দিতে পাকিস্তানী প্যারাট্রুপার নামানোর ফলে ভারতের কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আয়ুব খাঁ সম্ভবত ভাবেন নি, ভারত সীমানা পার হয়ে সরাসরি পাকিস্তান আক্রমণ করে বসবে এবং একটা পরিপূর্ণ যুদ্ধ বেধে যাবে। ঠিক একইভাবে 1987 সালে জেনারেল কে. সুন্দরজীর আমলে ভারতীয় সৈন্যদের প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত 'অপারেশন ব্রাসট্যাক্স' এর ফলে একটা যুদ্ধ প্রায় লেগে যাচ্ছিল—যা কিনা দুপক্ষের কারোরই অভিপ্রেত ছিল না। 1990 সালের মে মাসে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে, কাশ্মীরের ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে এক প্রবল গতিবিধি শুরু হয়। পাকিস্তান

সামরিকবাহিনী ধরেই নিয়েছিল আক্রমণ আসন্ন। বহু পাকিস্তানীই মনে করেন যে রাওয়ালপিণ্ডির কাছে চাকলা বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা এফ-16 জঙ্গি বিমানগুলিতে পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র লাগাতে শুরু করার খবর পাওয়ার পর ভারতীয় সৈন্যরা পিছু হটে যায়। অক্রমণ করার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের তৎপরতার কোনো ঘটনাই সে সময় ঘটে নি, কিন্তু ভুলধারণা বা রটনাগুলো থেকেই যায়। এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যেখানে গোয়েন্দা বিভাগের ভুল খবর বা হিসেবের সামান্য ভুলের জন্য যুদ্ধ লেগে গেছে অথবা যুদ্ধ লাগার উপক্রম হয়েছে। বেহিসেবের এইসব খবর আর দুপক্ষের মজুত পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার আমাদের আশংকা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

আমার বক্তৃতার শেষ ও পঞ্চম প্রশ্ন হলো, ভারতের এই পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে কি কি ঘটনা অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে পারে?

প্রথমেই হিসাব করা যাক কি কি পাল্টাবে না। কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ এই ঘটনার ফলে পাল্টাবে বলে মনে হয় না ; নৃশংসতা সেখানে চলতেই থাকবে। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের পাকিস্তানী জমি ব্যবহার করে কাশ্মীরে আক্রমণ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে যাবে আর বিজেপি-র পক্ষে তাদের লৌহমুষ্ঠি দেখানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। ফলত আগের মতোই একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও অন্যদিকে উগ্রপন্থীদের মাঝখানে কাশ্মীরীদের রক্ত ঝরতেই থাকবে। আর সাধারণ ভারতীয় ও পাকিস্তানীরা এই যুদ্ধের খরচ যুগিয়ে যাবে। আর জীবন আগের মতোই বয়ে যাবে দুই দেশে।

সবার আগে যেটা পাল্টাবে তা হলো দুই দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও তার শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ভারতের ক্ষতি করবে এবং পাকিস্তানী অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সামরিক খাতে ব্যাপক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য। এবং আমরা ধীরে ধীরে পারমাণবিক যুদ্ধের আরও কাছাকাছি হতে থাকব — যে যুদ্ধে জিতবে না কেউই, দুপক্ষই হারাবে অনেক কিছু।

আমরা আজ এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছি। এই মুহূর্তে যুদ্ধবাজদের হাতে বিজয়ের জয়ধ্বজা। কিন্তু সত্য শান্তিকামীদের পক্ষেই, যুদ্ধবাজদের পক্ষে নয় এবং একদিন সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের দুই দেশের ভাগ্যকে চিরকালের মতো বেঁধে দিয়েছে। এক দেশের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া আর এক দেশের ব্যাপক ক্ষতি ছাড়া সম্ভব নয়। কোনো পরিকল্পনা মাফিক নয় বরং দুর্ঘটনাবশত আমরা সীমানার দুই দিকে জন্মগ্রহণ করেছি। তাই দুই দেশের মধ্যে এই বিবাদ একেবারেই অর্থহীন, যদিও আজকের এই সভায় আমাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, তবু আজ এখানে আমাদের উপস্থিতি, সারা পৃথিবীর কাছে এমন কী আমাদের নিজেদের কাছেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের এই সভা অনাগত সেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী, যেদিন শান্তি ও সহযোগিতার প্রচেষ্টা যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ষড়যন্ত্রের ওপর জয়লাভ করবে। ❑

'গ্রীনপিস' প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার

'গ্রীনপিস' একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা পরিবেশ সুরক্ষার পক্ষে বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান চালিয়ে থাকে। বছর দুয়েক আগেও ফ্রান্স এবং চীনের পরমাণু বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এঁরা। সেই গ্রীনপিসের দুই প্রতিনিধি সাইমন ক্যারোল এবং বেন পিয়ার্সন সম্প্রতি এসেছিলেন আমাদের দেশে — পরমাণু বোমা পরীক্ষার ঘটনার অব্যবহিত কাল পরেই। মুম্বাইয়ের ***টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ার*** *সাংবাদিকেরা তাদের একটি সাক্ষাৎকার নেয়। 6 জুনের কাগজে তা প্রকাশিত হয়। সেটির বাংলা রূপান্তর করেছেন র. চ.।*

প্রশ্ন : ভারত সরকার মনে করে এই পরীক্ষাটি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ছিল। নিরাপত্তার প্রশ্নে কি কোনো ঝুঁকি নেওয়া যায়?

উত্তর : পারমাণবিক অস্ত্র যে নিরাপত্তা বাড়ায় এই অনুমান প্রশ্নের উর্ধ্বে নয় আর আজ। পারমাণবিক অস্ত্রের আচ্ছাদনে আপনি কখনই নিরাপদ বোধ করতে পারেন না। গত কয়েক সপ্তাহে দেখা গেল চারদিকে কি পরিমাণ উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে এই অস্ত্র।

সুইডেন অস্ট্রেলিয়া তাদের পরমাণু প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছে। যদিও এইপথে এগোনোর সামর্থ্য তাদের ছিল। কোনোরকম নীতিগত কারণে এমনটা করেছে মনে করার কারণ নেই। তারা দেখেছে এটা তাদের নিরাপত্তাকে বরং বিঘ্নিতই করবে।

পরমাণু অস্ত্রকে ডেটারেন্ট বা আক্রমণ ঠেকানোর উপায় বলে মনে করলেও আসলে সেটা স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে বাড়িয়ে তোলে — যাতে সকলেরই ক্ষতি। আমার প্রশ্ন, কোনো ভারতবাসী এক মাস আগে যখন এই পরীক্ষাটি হয় নি তার থেকে বেশি নিরাপদ বোধ করছেন কী এখন?

আসলে শান্তি মানে কিন্তু কেবল যুদ্ধ না হওয়াই নয় — আরো অনেক কিছু। নিরাপদ বোধ করা মানেই এমন অনেক কিছু নাগালের মধ্যে পাওয়া যা ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশের মানুষের পক্ষে বড়ই জরুরি।

আসলে পাকিস্তান ও চীনের সাথে ভারতের

সম্পর্ক বিগত পাঁচ বছর ধরে উন্নতির দিকেই এগোচ্ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে যে চীনের হাতে অনেক উন্নত আধুনিক অস্ত্র রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পথে না গিয়ে উচিত ছিল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলি কিভাবে ক্রমে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা যায় সে-ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

প্রশ্ন : পোখরানের এই পরীক্ষা পরিবেশ এবং মানুষের শরীরে কি ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে?

উত্তর : এব্যাপারে কিছুই বলা সম্ভব নয় যতক্ষণ না সরকারের তরফ থেকে সেখানে যেতে দেওয়া হচ্ছে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে দেওয়া হচ্ছে।

তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, মোটামুটি প্রতি তিনটি ভূর্গভস্থ পরীক্ষার মধ্যে একটি ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় গ্যাস বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ তেজস্ক্রিয়তা জলের মাধ্যমে বাহিত হয়ে ওপরেও উঠে আসতে পারে।

সরকারের পক্ষ থেকে এর কুপ্রভাবগুলিকে খাটো করে দেখা হয়েছে। এজন্যই আমরা দাবী করছি ভারত এবং পাকিস্তান দু-দেশই তাদের পরীক্ষাস্থল উন্মুক্ত করে দিক যাতে আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানীরা সে এলাকার অবস্থা খতিয়ে দেখতে পারে। দু-বছর আগে ফ্রান্স মুরুরোয় আটোলে তাদের পরীক্ষাস্থল ঘুরে পরীক্ষা করে দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : তোমরা চাইছ ভারত পাকিস্তান সিটিবিটি-তে সই করুক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই চুক্তির বয়ানে অনেক ফাঁক ফোঁকর রয়েছে। পাঁচটি পরমাণু অস্ত্রধর দেশ যখন তাদের মজুত অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করতে অথবা নানা কায়দায় পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা না চালানোর আশ্বাস দিতে রাজি নয় তখন ভারত কেন সেই চুক্তিতে সই করতে যাবে?

উত্তর : পরমাণু অস্ত্রধর পাঁচটি দেশের অস্ত্র সম্বরণে উদ্যোগী না হওয়ার ফলেই এবং এর মালমশলা প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে না পারার ফলেই, বিপর্যয় ডেকে এনেছে এই ভুখণ্ডে।

এ পর্যন্ত ভারত বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ উদ্যোগে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে এসেছে। কিন্তু এবারের এই পরীক্ষা তাদের অতীতের উজ্জ্বল ভূমিকাকে ম্লান করে দিয়েছে এবং দুনিয়াব্যাপী অস্ত্র-সম্বরণের আন্দোলনে তাদের প্রভাব খাটানোর নৈতিক অধিকার হারিয়েছে।

সিটিবিটি-র সাফল্য এইখানেই যে বিগত কয়েক দশকের চেষ্টায় পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা সীমিতকরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সিটিবিটি যদি কার্যকর না হয় তা হলে আগামী দিনে হয়তো সব দেশই এই অস্ত্রের পরীক্ষায় নেমে পড়তে পারে। সিটিবিটি যদি আরো নিশ্ছিদ্র হতো তাহলে অবশ্যই সেটা আনন্দের হতো, কিন্তু তা বলে যা হয়েছে সেটাকে ব্যর্থ করে দিলে কারো স্বার্থই সিদ্ধ হবে না। একেবারেই কিছু না হওয়ার থেকে নব্বই শতাংশ হওয়া তো নিশ্চয়ই কাম্য।

অন্য আরো অনেক কিছু আছে যা করা দরকার ঠিকই কিন্তু সেজন্য সিটিবিটিকে

বানচাল করা তো ঠিক নয়। আর ভারত যখন এমনটাই ঘোষণা করছে যে এই ধরণের পরীক্ষা আর তারা চালাবে না, তখন সিটিবিটিতে সই করায় আর বাধা থাকছে কোথায়?

প্রশ্ন : তোমরা কি ভারত ও পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করো?

উত্তর : নিজের ঘরে বিশাল পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র মজুত রেখে অন্য দেশ এই অস্ত্রের পরীক্ষা করলে তাকে নিন্দা করাটা এক ধরণের অসততা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ছিল অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি না করে নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। এই মার্কিন সরকার-ই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করে আসছে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে। তারাই মজুত করে তুলেছে বিরাট অস্ত্র সম্ভার এবং একই সাথে মদত দিয়ে এসেছে এই অস্ত্র সম্প্রসারণে। পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলোর ওপর ভারত ও পাকিস্তান সরকারের যদি ক্ষোভ থাকে তো সেটা হয়তো অসঙ্গত নয়, বুঝি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাদের সাম্প্রতিক আচরণ অনুমোদন করছি।

প্রশ্ন : পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে তোমাদের প্রচার এতদিন নির্ভর করে এসেছে সাধারণ মানুষের এই ধরণের অস্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদের ওপর। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শহরবাসী মানুষ দেখা যাচ্ছে অনেকেই সমর্থন করছে এই পরীক্ষাকে। এমন অবস্থায় কি পরিকল্পনা তোমাদের আছে যাতে করে সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারো?

উত্তর : মানুষকে জানাতে হবে কি পরিমাণ আর্থিক মূল্য দিতে হয় এ ধরণের অস্ত্র দৌড়ের পেছনে এবং কি ধরণের বিপদ লুকিয়ে আছে এর পেছনে। তাহলেই মানুষ বুঝতে পারবে অন্য অনেক জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্র আছে যেখানে এই অর্থ ব্যয় করা যেত। ভারতের মতো দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পরমাণু অস্ত্রের দৌড়ে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো দেশ দেউলিয়া হয়ে গেল। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও প্রায় চার কোটি মানুষ আছে যারা অর্থের জন্য দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে না। আমরা তাই মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয়গুলিকে সামনে রাখব প্রচারের ক্ষেত্রে। ❑

পড়ুন

বোমা-বিরোধী পুস্তিকা

পোখরান বিস্ফোরন

কার লাভ কার ক্ষতি

পরমাণু বোমার মানসিকতা—ভারতে

রবীন মজুমদার

বর্তমান রচনাটিকে বিষয়টির প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে। পরমাণু অস্ত্রের অনুকূলে যে সব যুক্তির ভিত্তিতে জনমত গড়ে ওঠে তার কয়েকটি পর্যালোচনার চেষ্টা হয়েছে এতে। এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা খুবই প্রয়োজন—লেখক।

একদিকে পরমাণু অস্ত্রসম্ভার স্তূপীকৃত হচ্ছে, প্রতিযোগিতা চলছে অব্যাহত, চলছে অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক শান্তিচুক্তির মহড়া, আর অন্যদিকে পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিন্তিত ব্যথিত মথিত হৃদয়ে নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলনে ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় সামিল হচ্ছে। মাপে ছোটো কিন্তু তাৎপর্যে বিরাট কিছু কিছু সাফল্য মিললেও কিন্তু এই সব নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন বিশ্বজোড়া পরমাণু অস্ত্র পরিস্থিতিতে ব্যাপক কোনো পরিবর্তন এখনও আনতে পারে নি। পরমাণু শক্তিধর ও শক্তিকামী দেশগুলির সরকারি নীতি ও কার্যক্রমের ওপর এই আন্দোলনের প্রভাব এখনও খুবই সীমিত। এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ও ভারতের সাম্প্রতিক নিউক্লিয়ার গতিবিধি বিশেষ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

পরমাণু অস্ত্রের ভয়াবহ ধ্বংসক্ষমতা, আয়নকারী বিকিরণের অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য দীর্ঘস্থায়ী কুফল, মনুষ্যবাসযোগ্য একমাত্র এই গ্রহ পৃথিবীতে জীবের অবলুপ্তির সম্ভাবনা, ইত্যাদি কোনো যুক্তিই আপাতদৃষ্টিতে সরকারি নীতি

এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1985 সংখ্যা 'বিওবি'তে। লক্ষণীয় এবারের বোমা বিস্ফোরণের পর সরকারি তরফে এর সমর্থনে যে-সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটি নিয়েই আলোচনা আছে এই লেখায়। তবে সংক্ষেপে। লেখক সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শুরুতেই। তবে এই মুহূর্তে সেটা সত্যিই জরুরি হয়ে উঠেছে।

প্রণয়নকারীদের তথা রাজনীতিবিদদের মনে খুব একটা দাগ কাটছে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, তাঁদের কাছে এই সব যুক্তি নিছকই 'আদর্শবাদী শান্তিকামীদের তাত্ত্বিক যুক্তি'। শান্তিকামীরা বিপদের সম্ভাবনাকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করেন এমন কথাও শোনা যায়। তাছাড়া, পরমাণু অস্ত্র দিয়েই পরমাণু অস্ত্রের প্রয়োগ ঠেকানো সম্ভব এমন একটা ধারণাও রাজনীতিক তথা নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। কঠোর বাস্তব অবস্থার গভীর পর্যালোচনা করেই অত্যন্ত দুঃখ ও ব্যথা নিয়েই তাদের পরমাণু অস্ত্রাদির পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হয় বলে তাঁরা দাবি করেন।

কঠোর বাস্তবতা

আলোচনাটিকে নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে তোলার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেই সীমিত থাকা যাক। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ভারত যদি পরমাণু অস্ত্র তৈরির সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা নেবে পাকিস্তানের অনুরূপ সিদ্ধান্তের (বাস্তব বা কাল্পনিক) প্রতিক্রিয়াতেই। পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হলে নাকি ভারতের—

1. নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার ঘোরতর আশঙ্কা।
2. জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।
3. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়) গুরুত্ব হ্রাস পাবে।
4. জনসাধারণের মনোবল ভেঙে যাবে, সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞানীদের হীনম্মন্যতা গ্রাস করবে।
5. প্রতিরক্ষাবাহিনীও হীনম্মন্যতার শিকার হবে এবং ফলে এমনকি সাধারণ অস্ত্রের সাধারণ যুদ্ধেও তাদের ভীতসন্ত্রস্ত আচরণ হবার সম্ভাবনা।
6. পরমাণু অস্ত্র তৈরির খরচ ভারতের সাধ্যাতীত নয়।
7. পরমাণু অস্ত্র প্রকল্প বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক।

বাস্তবতার অন্যদিক

উল্লিখিত প্রথম পাঁচটি যুক্তিকে এক সঙ্গে একটু বিচার করার চেষ্টা করা যাক। মান-সম্মান-মনোবল মাপার ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো মাপকাঠি নেই। পাকিস্তানেও অনুরূপ যুক্তি দেখানো খুবই সম্ভব। এসব কথা যে কোনো দেশের মানুষের মধ্যে সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তুলবে। আর সেন্টিমেন্ট যেখানে প্রবল বিজ্ঞানসম্মত র‍্যাশনাল চিন্তাভাবনা সেখানে দুর্বল হতে বাধ্য। ..... ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে খুব সহজেই শিক্ষিত মানুষরাও এ ধরণের সেন্টিমেন্টে আক্রান্ত হন। এটা নিছক প্যাট্রিয়টিজম বা দেশপ্রেম নয়, তারও কিছু বেশি। চীনও ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং অনেক আগে থেকেই চীন পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী। ইতিমধ্যে চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষও হয়েছে। অথচ চীন পরমাণু অস্ত্রধর অতএব আমাদেরও তা পেতেই হবে এমন দাবি ওঠেনি, যেমনটা ঘটছে পাকিস্তানের বেলায়। এর পিছনে রীতিমতো সাম্প্রদায়িক মনোভাব

কাজ করছে বলে মনে করাটা অসঙ্গত হবে না। পাকিস্তানের সম্ভাব্য পরমাণু বোমা তো ইতিমধ্যেই 'ইসলামিক বোমা' বলে আখ্যাত হয়েছে এবং কিছু কিছু মুসলিম দেশ তো 'ইসলামিক বোমায়' উদগ্র আগ্রহী।

এইভাবে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার শুরু, তার শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে না; পরিণতি ভাবতেও ভয় হয়। পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা একবার শুরু হলে উভয় দেশই চাইবে অন্য দেশের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে; উভয় দেশই চাইবে প্রয়োজনে আগাম চরম আঘাত হেনে শত্রু দেশের আক্রমণ সম্ভাবনা স্তব্ধ করতে। অন্তত সেভাবেই চলবে প্রস্তুতি। পরমাণু অস্ত্র দিয়েই পরমাণু অস্ত্র ঠেকানোর যুক্তির পেছনে কাজ করে থাকে এই ধরণেরই 'চূড়ান্ত ধ্বংসের পারস্পরিক নিশ্চিত ক্ষমতা'(Mutually Assured Destruction) অর্জনের তত্ত্ব। এরকম পরিস্থিতিতে শত্রুপক্ষের গতিবিধির আগাম নিশ্চিত খবরের জন্য বসানো যন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণেই পরমাণু যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আর সেদিক থেকে ভারত ও পাকিস্তানবাসীরা তাঁদের নিজ নিজ দেশের ওপর কতখানি আস্থা রাখতে পারেন?

পাকিস্তানের তুলনায় ভারত অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী দেশ। পরমাণু কার্যক্রমে তুলনামূলকভাবে বেশি অভিজ্ঞও ভারত। গান্ধীজীর দেশ বলে এবং ঐতিহ্যগতভাবেও শান্তিকামী বলে ভারত একদা বিশ্বে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার স্থান করে নিয়েছিল। পোখরান বিস্ফোরণ ও অন্যান্য নানা ক্রিয়াকলাপে তা কিছুটা ম্লান হলেও, পাক-ভারতের মধ্যে ক্ষতিকর পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সাম্প্রদায়িক জঙ্গিপনায় ইন্ধন না যুগিয়ে নিজস্ব সদিচ্ছা, সদাচরণ এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির দ্বারাই পাকিস্তানকে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পথ থেকে নিরস্ত করার প্রয়াস পেতে পারে ভারত, হতে পারে উপমহাদেশে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও প্রগতির অগ্রদূত।

পরমাণু-অস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার বদলে দুর্বলও করে তুলতে পারে। সাধারণ প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে ভাঁটা পড়তে পারে; আত্মসন্তুষ্টিও অধিকার করতে পারে। উপরন্তু পরমাণু প্রকল্প মাত্রই এক একটি মূর্তিমান নিরাপত্তাহীনতা ; যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বা এমনকি অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলেও সেগুলি আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। সর্বোপরি পরমাণু-অস্ত্রের কোনো সামরিক টার্গেট থাকা সম্ভব নয়, নির্বিচার ধ্বংসই তার বিশুদ্ধ ধর্ম। দেশের জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের মান-সম্মান ও মনোবল নষ্ট হবার কথা বলা হাস্যকর। এতগুলি বছরের প্রজাতান্ত্রিক জীবনেও যা পোক্তভাবে গড়েই ওঠেনি তা কমবে বা ভাঙবে কি করে? অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও সুবিধাভোগী শহুরে ক্ষমতাশীল মুষ্টিমেয় অংশের দম্ভ ও জেদের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের সম্মান ও মনোবলকে এক করে দেখা ঠিক নয়।

পরমাণু অস্ত্রধর দেশগুলির মধ্যে অনেকেই— চীন, রাশিয়া, এমনকি আমেরিকাও বলেছে যে তারা নিউক্লিয়ার অস্ত্রে অ-নিউক্লিয়ার দেশকে আঘাত করবে না। তাদের

মৌখিক আশ্বাসের ওপর তেমন গুরুত্ব না দিয়েও আশা করা যায় স্বাভাবিক বোধ ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই এই নীতিতে সমর্থন থাকবে। পরমাণু অস্ত্রসজ্জিত ভারত সাধারণ মানুষের এই প্রবল সমর্থন ও সহানুভূতি হারিয়ে কি অন্য অন্য পরমাণু অস্ত্রধারী দেশের মতোই স্বার্থপর আচরণ করবে? সচেষ্ট হবে যাতে অন্য কোনো দেশ পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী না হয় এবং তার নিজস্ব অবস্থান অটুট থাকে? .... দেশের সর্বাংশের মানুষের উন্নতি ও প্রগতিতে প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক রাজনৈতিক শক্তি পরমাণু অস্ত্রের প্রভাবে দাম্ভিক, কর্তৃত্বপরায়ণ ও স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠতেই পারে। জনসাধারণের ন্যায্য বিক্ষোভ আন্দোলনও তখন উপেক্ষা বা দমন করা সহজ হয় বৈকি!

পরমাণু অস্ত্রধর না হয়েও যথেষ্ট উন্নতি, আত্মবিশ্বাস ও মানমর্যাদার অধিকারী দেশের নজির রয়েছে চোখের সামনেই—জাপান, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশগুলি কি অনুন্নত, প্রভাবহীন? দেশের মানুষের সত্যিকার উন্নতি, শিক্ষা ও চেতনাই জাতির মান-সম্মান-নিরাপত্তার নিশ্চিততম গ্যারান্টি—পরমাণু বোমা বা প্রতিরিক্ষার বিশাল বাহিনী নয়, এই সাধারণ সত্যটুকু না বোঝা ভারত ও পকিস্তানের মতো দেশের পক্ষেই বুঝি সম্ভব।

খরচের খাতা

খরচের প্রসঙ্গটিও পৃথক ও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। দু-একটি প্রাসঙ্গিক দিকের উল্লেখ না করলেই নয়।

পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে উদ্যোগী হলে ভারতের ঠিক কি হারে খরচ পড়তে পারে? সঠিক হিসেব করা শক্ত, তবে অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন হিসেবের মধ্যে বিস্তর ফারাক : নীচের দিকে যেমন বছরে মাত্র পাঁচশো কোটি টাকার আনুমানিক হিসেব আছে, ওপরের দিকে তেমনি আট দশ হাজার কোটি টাকার অনুমানও করা হয়েছে। হিসেবের সূক্ষ্ম কচকচির মধ্যে না গিয়েও যদি আমরা ধরে নিই যে, মাঝামাঝি একটা অঙ্ক—ধরা যাক, বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন হলো — কতদিন এ হারে খরচ করা প্রয়োজন? খরচের বার্ষিক পরিমাণ কি একই থাকবে না দিনে দিনে বাড়বে, নাকি কমবে? বিশেষজ্ঞদের মতামতের একটা আনুমানিক গড় নিয়ে বলা যায় বর্তমান অবস্থা থেকে কার্যকরভাবে পরমাণু অস্ত্রধর হয়ে উঠতে ভারতকে বছর দশেক ধরে চেষ্টা চালাতে হবে। খরচের হার থেমে থাকার উপায় নেই— কাজে নামলে তা বছর বছর বাড়বেই— যে কোনো ভারতীয় প্রকল্পের সেটাই অভিজ্ঞতা। পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের আরও বিশেষত্ব এই যে—শুধুমাত্র বোমা কোনো কাজের কথা নয় — আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি নিখুঁত করে তোলার মধ্যেই নিহিত থাকে তার সাফল্য। বস্তুত, খরচের সিংহভাগ হতে হবে সেদিকেই। রিমোট কন্ট্রোল, রাডার, মিসাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সব ক্ষেত্রেই যেমন থাকবে নিরন্তর

আরো আরো উন্নত কার্যকর ও নিখুঁত ব্যবস্থার প্রশ্ন— অস্ত্রের বেলাতেও তেমনি থাকবে আরও উন্নত, আরও বিধ্বংসী করে তোলার নিরন্তর প্রয়োজন। খরচ বাড়তেই থাকবে, কি হারে তা বলা মুশ্‌কিল। কিন্তু একবার এগোলে আর পিছনো যাবে না। তবুও ধরে নেওয়া যাক, দশ বছর ধরে ভারতকে একই হারে বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে—তাই যথেষ্ট। প্রশ্ন হলো —এটা কি ভারতের পক্ষে অনায়াসসাধ্য?

মোট জাতীয় আয়ের 4 বা 5 শতাংশ যদি পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় তবে তা ভারতের পক্ষে অনায়াসসাধ্য না সাধ্যাতীত এমন কথা বলা শক্ত যদি না আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া যায়, কোন্ নিরিখে সাধ্যাসাধ্যের বিচার করব।

বস্তুত সাধ্যাসাধ্যের প্রশ্নটি মূলত একটি দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রশ্ন। উন্নত মানবসম্পদে বলিয়ান দেশ না বিধ্বংসী অস্ত্রে শক্তিশালী দেশ— কোন্‌টি আমাদের কাম্য? পাঁচ হাজার কোটি টাকায় ভারতের বহু গ্রামে পানীয় জল, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। প্রশ্ন হলো, আমরা তা না করে পরমাণু অস্ত্রের পিছনে ঢালার সাধ্য দেখাব কিনা। যদি দেখাই তবে প্রথম থেকেই দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই শুরু হবে অর্থনৈতিক যুদ্ধঘোষণা। সম্পূর্ণ অনুৎপাদক এই বিশাল খরচের বোঝা বইতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকেই এবং ঘুরে ফিরে নানা ব্যবসায়িক সূত্রে মুনাফা জমবে সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশে যাদের উন্নতির অন্যতম প্রধান উৎস হলো অস্ত্র ঘিরে ব্যবসা। যারা সুকৌশলে আঞ্চলিক উত্তেজনায় ইন্ধন জোগায় বরের ঘরের মাসি ও কনের ঘরের পিসি সেজে, যে কোনো অনুন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশের যুদ্ধসাজের পরিকল্পনায় সবচেয়ে উল্লসিত হয় তারাই।

প্রসঙ্গত, আর একটি কথাও উল্লেখ্য। যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, আধুনিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জামও এখন রীতিমতো ব্যয়বহুল; তুলনামূলক বিচারে পরমাণু অস্ত্র বেশি ব্যয়সাপেক্ষ মোটেই নয়। তা হলেই বা কি আসে যায়? পরমাণু অস্ত্রকে বিকল্প প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম হিসেবে কেউই গণ্য করবে না। প্রতিরক্ষা খরচ যা হবার তা তো হবেই (বরং বাড়বে। দ্রুতহারে!) পরমাণু অস্ত্রের ব্যয় তার ওপর বাড়তি।

তবুও 'বোমা মহল' বলবেন—একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু খরচ মোটেই আমাদের অসাধ্য নয়! ভুট্টোর সেই ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণ করা যায়—পাকিস্তানবাসীকে ঘাস খেয়ে থাকতে হলেও বোমা চাই!

উন্নয়ন সহায়ক বোমা

শ্রীমতী গান্ধী প্রায়ই বলতেন, ভারতের মতো বিশাল দেশে মহাকাশ গবেষণা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। সমুদ্রবিজ্ঞান আমাদের খাদ্য ও খনিজের যোগান বাড়াতে পারে, ইত্যাদি। পরমাণু প্রকল্পাদির বেলাতেও সেই যুক্তির জের টেনে বলা হয়— এ খাতে খরচ মোটেই অপচয় নয়; বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে এতে।

পরমাণু অস্ত্রের শান্তি সহায়ক ভূমিকার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখা যাক উন্নয়ন-সহায়ক ভূমিকার যুক্তিটি কতটা গ্রহণযোগ্য।

প্রথমেই আসে পরমাণু-বিদ্যুতের প্রসঙ্গ। শক্তি সমস্যার সমাধানে পরমাণু-বিদ্যুৎ একমাত্র বিকল্প—একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা হচ্ছে, এবং সাধারণ মানুষের মনেও স্বভাবতই আশা জাগিয়ে তুলছে। দু-হাজার সালের মধ্যে দশ হাজার মেগাওয়াট পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক বড়সড় প্রকল্পও ভারত ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে। কিন্তু হায়, শেষ পর্যন্ত কতটা বিদ্যুৎ তৈরি হবে আর কতটা উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে তা নিয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ অবশ্যই আছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আর প্রকৃত উৎপাদন এক নয়। ভারতে চালু রিঅ্যাক্টরগুলি থেকে তাদের ক্ষমতার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্রই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এবং তার দ্বারা পরমাণু শক্তিকেন্দ্রগুলির প্রয়োজনটুকুও মেটে কিনা সন্দেহ।

অনেকে হয়তো মনে করছেন, বোমা বা অস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে আবার বিদ্যুৎ নিয়ে টানাটানি কেন? যদি বলা হয়, পরমাণু-বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি পরমাণু অস্ত্র প্রকল্পের প্রস্তুতিপর্ব তবে অনেকেই হয়তো হৈ হৈ করে উঠবেন। কিন্তু তথ্য কি বলে?

পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রিঅ্যাক্টর থেকে উপজাত হিসেবে পাওয়া যায় প্লুটোনিয়ামের বিশেষ আইসোটোপ যা অ্যাটম বা ফিশন বোমার প্রধান উপকরণ। অবশ্য অন্য দেশের সহযোগিতায় তৈরি রিঅ্যাক্টর থেকে যে প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায় তা আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে এবং বোমা তৈরির কাজে তাকে লাগানো দুরূহ। তার জন্য চাই সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্বে বিধিনিষেধ মুক্ত প্লুটোনিয়াম পাবার উপযুক্ত রিঅ্যাক্টর (তাও আবার শোনা যাচ্ছে অকেজো হয়ে পড়েছে!); অবশ্যই তা শান্তিপূর্ণ গবেষণার জন্যই, কিন্তু জ্ঞাতিশত্রু পাকিস্তান যদি মানতে না চায়?

পরমাণু উৎসাহীরা নিশ্চয়ই বলবেন—নিজস্ব দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞান দিয়ে যদি আমরা পরমাণু বিদ্যুৎ এবং হ্যাঁ, এমনকি বোমাও বানাতে পারি তাহলে তা কি প্রচণ্ড এক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির তথা সাফল্যের নজির নয়? আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদিতেও অনুরূপ দক্ষতা অর্জিত হবে এবং তার ছাপ কি সামাজিক উন্নয়নে পড়বে না? তত্ত্বগতভাবে একথা অস্বীকার না করেও বলা যায় — বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মাপকাঠি পরমাণু-বিদ্যুৎ বা অস্ত্র নয় — অন্য কিছু। পরমাণু প্রকল্প দেশের একাংশ বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীর অর্থ প্রতিপত্তি প্রভূত বাড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দ্যোতক হতে পারে না..... অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যদি নামতেই হয় তবে সরাসরি উন্নয়নমূলক কাজে তা হয় না কেন? কেন নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পগুলি বারে বারে টাকার অভাবে বা পরিচালনার দোষে বা অন্য কোনো কারণে মাঝপথে থেমে যায়?

বস্তুত, বোমা-লবি দেশের সমস্ত ত্রুটি ও পশ্চাৎপদতার দাওয়াই হিসেবেই পরমাণু অস্ত্রের দাবি তুলতে পারে— আমরাও কি তাতে সায় দেব ? ❑

বহুল উচ্চারিত সিটিবিটি-র স্বরূপ

শুভশিস মুখোপাধ্যায়

সিটিবিটি-র মুখবন্ধ অংশে চুক্তির পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

ক. যে কোনো ধরণের পরীক্ষামূলক নিউক্লিয় বিস্ফোরণ বন্ধ করলে নিউক্লিয় অস্ত্র উদ্ভাবন এবং অস্ত্রের আধুনিকীকরণ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং এর ফলে দেশে দেশে নিউক্লিয় অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমবে।

খ. পরীক্ষামূলক নিউক্লিয় বিস্ফোরণ রোধের সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো একটি সর্বাঙ্গীণ নিউক্লিয় বিস্ফোরণ রোধ চুক্তির মুসাবিদা করা এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোকে সেই চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের জন্য অনুরোধ করা।

গ. এই চুক্তি সম্পাদিত হলে, 1963 সালে সম্পাদিত বায়ুমণ্ডলে, মহাবিশ্বে, সমুদ্রগর্ভে এবং ভূগর্ভে পরীক্ষামূলক নিউক্লিয় বিস্ফোরণ যে কোনো মাত্রারই হোক না কেন নিষিদ্ধ হবে; এরফলে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষামূলক নিউক্লিয় বিস্ফোরণ রোধ করা সম্ভব হবে।

এখানে লক্ষণীয় যে চূড়ান্ত নিরস্ত্রীকরণের বিকল্প হিসাবে চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা নিরোধের কথাই চুক্তিতে প্রাধান্য পাচ্ছে।

এইবার এই চুক্তির মূল দায়বদ্ধতার দিকটি দেখা যাক। চুক্তির প্রথম অনুচ্ছেদে এই দায়বদ্ধতার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে :

---

*সিটিবিটি-র পুরো কথা হলো Comprehensive test ban treaty। এই শব্দটি সম্প্রতি আকছার ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও চুক্তিটি সম্পর্কে সার্বিক কোনো পর্যালোচনা আজ পর্যন্ত স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়ে নি। সংক্ষেপে এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন লেখক। — অবশ্যই তাঁর মতামত সহ। যদিও সময় ও স্থানাভাবে বিশদে ব্যাখ্যা করার সুযোগ তাঁকে দেওয়া যায় নি। এখানে উল্লেখ্য, এই আলোচনাটি লেখকের **'কালধ্বনি'** পত্রিকাতে দেওয়া বিস্তৃততর একটি বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধের অংশ বিশেষ।*

1. স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশ নিজের বা তার অধিকারে থাকা ভূখণ্ডে কোনো ধরণের নিউক্লিয় অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটবে না এবং এই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটানোর সম্ভাবনাকে রোধ করবে।
2. স্বাক্ষরকারী দেশ কোনোভাবেই পৃথিবীর কোথাও নিউক্লিয় অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বা অন্যান্য কোনো ধরণের নিউক্লিয় বিস্ফোরণ ঘটানোতে উৎসাহ প্রদান করবে না বা সেই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণে অংশগ্রহণ করবে না। জেনেভা বিধির পর এইটাই প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরের চুক্তি যেখানে সব দেশের যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যে সব দেশের নিউক্লিয় শক্তি এবং/অথবা নিউক্লিয় অস্ত্রের কার্যক্রম আছে, এবং/অথবা নিউক্লিয় চুল্লি আছে তাদের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে এই চুক্তিতে সই করতে হবে। মার্কিন সরকারের মতে, এই জাতীয় দেশের সংখ্যা 44 — এদের প্রত্যেককেই এই চুক্তির পক্ষ হতে হবে। যদি কোনো একটি দেশও এই চুক্তিতে সই না দেয় (যেমন ভারত ঘোষণা করছে তারা এই চুক্তি সই করবে না) তবে এই চুক্তি, বিধির রূপ পাবে না। সে ক্ষেত্রে, বেশির ভাগ দেশ, চুক্তি সই-এর তিন বছর পর এই চুক্তি কিভাবে সই না করা দেশ গুলোর জন্য বিধিবদ্ধ করা যায় তার উপায় বের করার জন্য সম্মিলন ডাকবে। 1996 সালের জুন মাসের পর থেকে সেই তিন বছরের মেয়াদ 1999 সালের 17 জুন শেষ হচ্ছে।

এই চুক্তি অনিশ্চিত কাল ধরে বলবৎ থাকবে। কিন্তু জেনেভার চুক্তির মতো এই চুক্তি এক তরফা নয়; এই চুক্তি পছন্দ না হলে ছ-মাসের আগাম জানান দিয়ে চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসা যাবে।

কেন এই চুক্তি বৈষম্যমূলক?

ক. এই চুক্তি, নিউক্লিয় ক্লাবের সদস্যদের জন্য বাড়তি সুবিধে দিচ্ছে। তারা আগে এই বিপজ্জনক খেলা শুরু করে আজ 'অহিংস' হয়ে অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন এই চুক্তির সপক্ষে সওয়াল করার পর সেনেটরদের এই সিদ্ধান্ত জনিয়ে মার্কিন জনসাধারণকে আস্বস্ত করতে যে বিবৃতি দেয় তার নির্যাস হলো :

1. এই চুক্তির ফলে, যে সব দেশ এখনও নিউক্লিয় বোমা বানিয়ে উঠতে পারেনি অথবা যারা ঠিক বোমা বানানোর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তারা পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সুবিধে থেকে বঞ্চিত হবে, ফলে তাদের পক্ষে নিউক্লিয় অস্ত্র সম্ভার বানানো দুরূহ বা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মার্কিন সরকার অন্যান্য দেশের সরকারের মতোই পরীক্ষা নিরোধ অবস্থার মুখোমুখি হবে এবং আন্তর্জাতিক নজরদারির ফলে কেউই চুপিসারে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না। কিন্তু এযাবৎ কালে দুহাজারের ওপর নিউক্লিয় বিস্ফোরণের মধ্যে 1030-টিই ঘটিয়েছে

মার্কিন সরকার, ফলে মার্কিন সরকারের হাতে নিউক্লিয় অস্ত্র নিখুঁত করা এবং আধুনিকীকরণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য জমা আছে। অর্থাৎ নিউক্লিয় অস্ত্রের ব্যাপারে তার একচ্ছত্র অবস্থান বজায় রাখতে পারবে।

খ. এই চুক্তির অনুচ্ছেদ দুই, 24 নং পরিচ্ছেদে সদস্য নির্বাচন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান থেকে কটি করে দেশ প্রতিনিধিত্ব করবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। একই অনুচ্ছেদে 29 নং ধারায় নির্বাহী সমিতিতে এই দেশগুলোর নির্বাচনের প্রশ্নে যে পদ্ধতি বাৎলানো হয়েছে তা অদ্ভুত। এই সব ভৌগোলিক অবস্থান থেকে অন্তত একের তিন ভাগ প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হবে তাদের 'নিউক্লিয়' ক্ষমতার ভিত্তিতে (অর্থাৎ যার যার হাতে বোমা বেশি থাকবে, সেই সেই দেশ নির্বাহী সমিতিতে গিয়ে চূড়ান্ত নীতি নির্ধারণ করবে!) এছাড়াও, এই চুক্তি নির্বাহের জন্য যে সংগঠন আছে, তার তহবিলে যে সব দেশ যত বেশি বার্ষিক চাঁদা দিতে পারবে সেই সব দেশ বেশি বেশি করে মনোনীত হবে। চুক্তির এই অনুচ্ছেদগুলো আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং গ্যাট চুক্তির মুসাবিদা থেকে সরাসরি আমদানি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বজায় রাখার আন্তর্জাতিক সমঝোতা যেমন GATT, WTO, IMF এবং বিশ্বব্যাঙ্কের মতো, কুটনৈতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমরায়ণের প্রশ্নে বৈষম্য বজায় রাখার উপায় (Instrument) হলো এই সিটিবিটি।

গ. এই চুক্তির অনুচ্ছেদ 8-এ চুক্তি পুনর্বিবেচনার প্রশ্নে সরাসরি চুক্তিকে নাকচ করার প্রস্তাবেই সায় দিয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, কার্যকর হওয়ার পর 10 বছর বাদে যদি কোনো রাষ্ট্র চায় তবে এই চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা হবে। মনে রাখতে হবে, এই চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, এই চুক্তি অনন্তকাল চলবে! এই পুনর্বিবেচনায় যদি মনে হয় যে 'শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের' জন্য ভূগর্ভ বিস্ফোরণ প্রয়োজন তবে সেই রাষ্ট্র ভূগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে (অর্থাৎ চুক্তির মূল দর্শনই নাকচ করার অধিকার দেওয়া হচ্ছে)। কারা এই পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাতে পারবে? যারা তহবিলে বেশি টাকা দেবে এবং/অথবা যাদের হাতে নিউক্লিয় বোমা আছে!

ঘ. এই চুক্তি সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের বিপরীতে বোমা বানানো এবং বোমা মজুত রাখার নৈতিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে, তা পরীক্ষা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণকে পেছন থেকে ছুরি মারার যে মার্কিন কূটকৌশল, এই চুক্তি তাকেই মদত দিচ্ছে।

এই চুক্তি সর্বৈব বৈষম্যমূলক কেননা বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং মার্কিন স্বার্থ কখনই এক নয়।

আমরা কার পক্ষে ?

এতক্ষণ ধরে আমরা সিটিবিটির বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি সাজিয়েছি, প্রায় এই যুক্তি

সাজিয়ে বিশ্বের অনেক যুদ্ধবাজ সরকার (যেমন ভারত, পাকিস্তান, এবং অন্যান্য দেশসমূহ) সিটিবিটি-তে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছে। এক্ষত্রে আকস্মিকভাবে আমাদের এবং তাদের যুক্তি জাল মিলে গিয়েছে। কিন্তু তাদের এই সিটিবিটির বিরোধিতা আত্মমর্যাদা বা বৈষম্যের বিপরীতে ন্যায় বিচারের পক্ষে নয়। আন্তর্জাতিক স্তরে যাবতীয় বৈষম্যমূলক চুক্তি যা মার্কিন সরকারের হাত শক্ত করেছে, এরা ব্যতিক্রমহীনভাবে চূড়ান্ত অমর্যাদাকর, বৈষম্যমূলক WTO. GATT বা অন্যান্য চুক্তির অংশীদার। এরা চূড়ান্তভাবে নিরস্ত্রীকরণের বিপক্ষে অর্থাৎ মার্কিন স্বার্থের চৌখস সমর্থক। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের প্রশ্নে এদের অবস্থান এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ অবান্তর। আমাদের বিচারে এরা সবাই এক। মার্কিনী দাদাগিরির এবং দুনিয়া জুড়ে মার্কিনী দস্যুবৃত্তির পক্ষের লোক।

সিটিবিটি-র বিপক্ষে আরও একদল মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন নিউক্লিয় অস্ত্র, নিউক্লিয় যুদ্ধসহ যে কোনো বড় ধরণের যুদ্ধের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। এরা পরোক্ষে শান্তির পক্ষেই এবং গুরুত্বসহকারে এঁদের যুক্তি অনুধাবন করা প্রয়োজন। যাঁরা অস্ত্রের সমতার জন্য যুদ্ধ হবে না বলে মনে করেন, তাঁরা আজকের অন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তনকে সম্ভবত হিসেবের মধ্যে আনেন না। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে এই যুক্তির খানিকটা ধার ছিল, আজকে এই যুক্তি অনেকটাই ভোঁতা। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে, অস্ত্রের সমতার জন্য নিউক্লিয় যুদ্ধ হবে না, তাতেও কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচী শোচনীয়ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। 1945 সালের পর বিভিন্ন স্থানীয় যুদ্ধে, সনাতনী অস্ত্রের আঘাতে যত সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সংখ্যা সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (নাগাসাকির-হিরোশিমা সহ) প্রায় দ্বিগুণ। অসামরিক ক্ষয়ক্ষতির নির্ভরযোগ্য হিসেব নেই। 1960 থেকে 1970 এই দশকে সাতটি, 1970 থেকে 1980 এই দশকে নটি এবং 1980 থেকে 1990 এই দশকে চোদ্দটি বড় মাপের যুদ্ধ হয়েছে। প্রতি দশকে অস্ত্র সম্ভারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুদ্ধের সংখ্যা বেড়েছে। 1990 থেকে সমগ্র বোসনিয়া অঞ্চল, আফগানিস্তান, ইন্দোচীন স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নিউক্লিয় বোমা থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া নিশ্চিহ্ন। ইরাক যুদ্ধে সম্ভবত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সনাতনী অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে (কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি এই যুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার ঠেকাতে পারেনি) এবং সামরিক ও অসামরিক মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা প্রচুর। নিউক্লিয় বোমা বানানোর ঢালাও লাইসেন্স কি নিরস্ত্রীকরণ তথা বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সহায়ক?

এই 'অস্ত্রের সমতা'র যুক্তি তখনই ধোপে টেঁকে যখন বিবদমান দেশগুলোর সনাতনী অস্ত্রের সম্ভার সমান সমান। আজকের দুনিয়ায় স্থানীয় শক্তি হিসেবে অনেক দেশই আত্মপ্রকাশ করছে— আমাদের দেশ ভারত এর চমৎকার উদাহরণ। ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর থেকে (চীন-রাশিয়া ছাড়া) সনাতনী অস্ত্রের সম্ভারে বহুদূর এগিয়ে রয়েছে তদুপরি তার রয়েছে নিউক্লিয় বোমা। সংখ্যার দিক থেকে ভারতের বোমা সম্ভবত এতই নগণ্য যে তা দিয়ে চীন রাশিয়ায় সমতুল্য হওয়া যাবে না। আবার

অনুমান করা যায় পাকিস্থানের হাতেও স্বল্প সংখ্যক (ভারতের তুলনায়) নিউক্লিয় বোমা রয়েছে এবং ভারত পাকিস্তানের সামরিক শক্তির অনুপাত অন্তত 2 : 1। এই অবস্থায় ভারত প্রথম নিউক্লিয় আক্রমণ (পাকিস্তানের তরফে) সহজেই সামাল দিতে পারবে এবং দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে হয়তো নিউক্লিয় বোমা ভারত ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ সমতা আনতে হলে পাকিস্তানের প্রায়োজন এমন বোমা যা তাকে প্রথম আক্রমণের ফলে বিজয়ের নিশ্চয়তা দেবে। ভারত এই দৌড়ে এগিয়ে থাকার ফলে এই দৌড় ক্রমাগত বেড়েই চলবে এবং এর ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমার পরিবর্তে বেড়েই চলবে। এছাড়াও আক্রান্ত হলে প্রতি আক্রমণের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাদি না করতে পারলে অস্ত্রের সমতার ফলে শান্তির যে নিশ্চয়তার কথা 'সমতা'র তত্ত্বে বিশ্বাসী বন্ধুরা বলছেন তা কতটা কার্যকর, এটাও তাদের ভেবে দেখতে বলি। চীন-রাশিয়া-আমেরিকা-ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের এই প্রতি-আক্রমণ ব্যবস্থা বেজায় জবরদস্ত। আজ ভারত ও পাকিস্তানকে সে পর্যায়ে যেতে গেলে সারা দেশ শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী অস্ত্রসম্ভার এবং প্রতি-আক্রমণে সদাপ্রস্তুত স্বয়ংক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্রে ছেয়ে ফেলতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলি, এই দৌড়ে অংশ নিয়ে এতবড় ধনসমৃদ্ধ দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন দুনিয়ার মানচিত্র থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি ধরা পড়ে যখন শান্তি আন্দোলনের প্রবক্তারাই নিরস্ত্রীকরণের প্রথম ধাপ হিসেবে এটাকে বৈষম্যমূলক এবং যথেষ্ট কাজের নয় বলে স্বীকার করে নিয়েও সিটিবিটি-র পক্ষ নেন। তাঁদের যুক্তিতে ধার আছে এবং হয়তো ওজনও আছে। তাঁরা আমাদের শিবিরেরই লোক এবং তাঁদের যুক্তিও ধৈর্য সহকারে অনুধাবন যোগ্য। তাঁদের মূল যুক্তি তিনটি যোগ্য :

1. এই চুক্তি নিরস্ত্রীকরণের জন্য যথেষ্ট না হলেও এটি নিশ্চয়ই একটি প্রয়োজনীয় প্রথম ধাপ। যখন আন্তর্জাতিক স্তরে সমঝোতার ফলে যুদ্ধবাজদের অন্তত পরীক্ষা থেকে বিরত করা যাচ্ছে এবং এমন এক অবস্থায় যখন নিউক্লিয় যুদ্ধের ছায়া আমাদের গ্রাস করতে চলেছে, তখন এই চুক্তি না মানা বিপজ্জনক।

   আমরা বলি, যদি এই চুক্তি নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে সামান্যও সহায়ক হতো তবে আমরাও প্রয়োজনীয় প্রথম ধাপ হিসেবে এই চুক্তির অগুণ্তি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা মেনে নিতাম। কিন্তু এই চুক্তি বোমার অস্তিত্ব সর্বসাধারণে স্বীকার করে নেবার লাইসেন্স প্রদান করছে, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে মারণ কৌশলের আধুনিকীকরণে উৎসাহ দিচ্ছে। এই চুক্তির ফলে যাদের হাতে এখুনি বোমা আছে বা যারা দীর্ঘদিন চুল্লি চালাচ্ছে তারা কমপিউটার সিমিউলেশন দিয়ে অনেকগুণ বিধ্বংসী বোমার নক্শা নিঁখুত করে ফেলবে। এই অবস্থা, সিটিবিটি না থাকলেও চলছে-চলবে। সিটিবিটি, এই অরাজকতার বিরুদ্ধে বাড়তি কোনো নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারছে না।
2. সিটিবিটি-কে শুধু একটি মার্কিন ধাপ্পাবাজি বলে দেখা উচিত নয়; এটি একটি

বহুজাতিক সমঝোতা যা ভারত ও পাকিস্তান নাকচ করেছে। গ্রীনপিস এর জাপানি হিবাকুশারাও এই মতে বিশ্বাসী এবং এদেরকে মার্কিন দালাল বলা চলে না।

এটা ঠিকই গ্রীনপিস ও জাপানি হিবাকুশাদের লাগাতার শান্তির স্বপক্ষে প্রচার এবং সক্রিয় আন্দোলনের ফলেই দুনিয়া জোড়া অরাজকতার মধ্যেও আশার আলো দেখা যাচ্ছে। তাঁদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় ও পথ নির্ধারণের ওপর সিটিবিটি-কে তাঁরা এই মুহূর্তে কি ভাবে ব্যবহার করবেন তা তাঁরাই ঠিক করবেন। কিন্তু ভারত অংশীদার না হওয়ায় যে চুক্তি বিধিবদ্ধ হচ্ছে না, সেই দেশের নাগরিক হিসেবে, আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন হতেও পারে। এতে হিবাকুশা বা গ্রীনপিসে-র সংগ্রামী ঐতিহ্যকে নাকচ করা হয় না।

যেমন গ্রীনপিস বা হিবাকুশাদের কেউই স্বপ্নেও ইয়াংকি দালাল বলবে না, তেমনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকেও কেউ বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সংগ্রামী যোদ্ধা বলবে না। এই চুক্তি সম্পর্কে তিনি মার্কিন সেনেটে বলেছেন :

"যাঁরা আজকে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরের বিরোধিতা করছেন তাঁরা দিগন্ত দেখতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এমন একটি চুক্তি ব্যতিক্রমহীনভাবে মার্কিন স্বার্থের পক্ষে। মার্কিন দেশের নিউক্লিয় অস্ত্রের ক্রমাগত পরীক্ষা করার কোনো কারিগরি তাগিদ নেই। মার্কিনী অস্ত্রসম্ভার বিপদহীন, নির্ভরযোগ্য এবং এই অবস্থা সুদূর ভবিষ্যতেও একই থাকবে। যদি কোনো অবস্থায় এমনটি ঘটে যে, নিউক্লিয় অস্ত্রের কোনো গুরুতর পরিবর্তন ঘটাতে হবে তবে তা আমরা নিউক্লিয় পরীক্ষা ব্যতিরেকেই সম্পন্ন করতে পারব। এতেও সমস্যার সমাধান না হলে সহজেই ছ-মাসের অগ্রিম জানান দিয়ে আমরা এই সমঝোতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।

অন্যদিকে এই চুক্তির ফলে মার্কিনী সুরক্ষার সুবিধে প্রচুর। এই চুক্তির ফলে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশ-সমুহের পক্ষে মার্কিনীদের চেয়ে বেশি কৃৎকৌশল সম্পন্ন নিউক্লিয় বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র বানানো অসম্ভব হবে। আবার আমরা যদি সিটিবিটি মেনে চলি তবে নিউক্লিয় অস্ত্রের প্রসার রোধ চুক্তি দিয়ে আমরা অন্যান্য দেশের নিউক্লিয় গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে মার্কিন দেশ যে নিউক্লিয় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তার তীব্রতা কমবে এবং মার্কিন সামরিক ভারসাম্য কিছু মাত্র না কমিয়েই আমরা আমাদের সুরক্ষা অনেকগুণ বাড়িয়ে নিতে পারব।" [হোয়াইট হাউসে প্রদত্ত বক্তৃতা, 11.4.95] —এর পর আর মন্তব্য সম্ভবত নিস্প্রয়োজন।

3. নিরস্ত্রীকরণ একটি ন্যায়নীতির প্রশ্ন — এটাকে কৌশলগত প্রশ্ন হিসেবে দেখা ঠিক নয়। এই চুক্তির ফলে যদি একটি পরীক্ষাও রোখা যায় তবে তা ন্যায়নীতির জয় বলে ধরা উচিত। এটা একটা খাঁটি যুক্তি এবং এই প্রশ্নে বাম-ডান নির্বিশেষে প্রায়

সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি চূড়ান্ত দ্বিচারিতার পরিচয় দিয়েছে। চীন-রাশিয়ার পরীক্ষায় বামেরা বলেছেন এই পরীক্ষা আমেরিকাকে জব্দ করবে। ফলে সঙ্গত কারণেই বাজপেয়ির হুঙ্কারের কাছে তাদের মিউ মিউ করা ছাড়া গতি নেই।

তবে আমরা যারা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে, WTO-GATT-IMF বিরোধিতা করছি, আমরা তো এক ধরণের ন্যায়নীতির নিরিখেই তা করছি। যে চুক্তির মূল ভিত্তিভূমি চূড়ান্ত অন্যায়, অমানবিক এবং অগণতান্ত্রিক সেক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ থাকতে গেলে সেই চুক্তির বিরোধিতা না করে উপায় কি?

করণীয় কিছু আছে কি?

আমরা জানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে একমাত্র দেশ যারা কোনো সতর্কবাণী ছাড়াই দুটি শহরের অসামরিক জনগণের ওপর নিউক্লিয় বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। সেই মার্কিনীদের দুনিয়ার মানুষকে নিউক্লিয় অস্ত্র পরীক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া সাজে না। তবে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি আমরা কি যুদ্ধ চাই? যদি না চাই তবে প্রথমে আমরা আমাদের অস্ত্রসম্ভার ধ্বংস করি। অপেক্ষা করার দরকার নেই কবে পাকিস্তান-চীন-আমেরিকা তাদেরটা ধ্বংস করবে।

আজকের এই স্বার্থপর যুগসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আমরা স্বোচ্চারে আবার আন্তর্জাতিকতার বাণী উচ্চারণ করি — বিশ্বের নিউক্লিয় বিরোধী মানুষ এক হও। আমাদের হারানোর মতো আছে কিছু বিধ্বংসী বোমা, আর অপেক্ষা করে আছে এক বোমামুক্ত ন্যায়নিষ্ঠ, বাসযোগ্য পৃথিবী।

"এ পথেই আলো জ্বেলে মানুষের ক্রমমুক্তি হবে। সে অনেক শতাব্দীর কাজ....."

❑❑❑

ভারতের নিউক্লিয়ার অস্ত্রে শক্তিধর হতে কত খরচ

প্রাথমিকভাবে ভারত নিউক্লিয়ার অস্ত্রে শক্তিধর হতে খরচ হবে 75 বিলিয়ান ডলার (বা আজকের হিসেবে 3,15,000 কোটি টাকা) — বলেছিলেন লোকসভার সদস্য যশোবন্ত সিং, ষোলো বছর আগে।
[*The Statesman*, 13 May 1982]।
জবাহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক টি. টি. পৌলুস ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সূত্রে জেনেছেন, ওই খরচ 84,000 কোটি টাকা।
[T.T. Poulose : 'The CTBT and the Rise of Nuclear Nationalism in Indian' *Lancers*, New Delhi, 1996, পৃষ্ঠা 193-41]।

আর নিউক্লিয় পরীক্ষা নয়, আর বোমা নয়

প্রফুল বিদোয়াই

অরওয়েলের 1984 বইতে আছে : "যুদ্ধই শান্তি ; মুক্তিই দাসত্ব ; অজ্ঞতাই শক্তি।" এরই কাছাকাছি অন্য একটি বাণী আমাদের শোনানো হলো সম্প্রতি : 'অস্ত্রীকরণই নিরস্ত্রীকরণ'। আমাদের বলা হয়েছে ভারতের সাম্প্রতিক পরীক্ষামূলক পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগে সাহায্য করবে। শত্রুপক্ষের দিক থেকে আক্রমণ ঠেকানোর জন্যই বানানো হয়েছে এটা ; অন্যদের ভয় দেখানোর জন্য নয়। নিউক্লিয় অস্ত্রধর দেশগুলো এই অস্ত্রের সমর্থনে যা যা বলে থাকে এটা তেমনই তোতাপাখির মতো আওড়ানো। পাকিস্তানও ঠিক একই কথা বলেছে তাদের ছটি বোমার পরীক্ষার পরে। নিউক্লিয় অস্ত্রের অধিকার অর্জনের অর্থ আসলে কি তা টের পাওয়া গেছে এই অস্ত্রের পরীক্ষার শেষে যে উন্মাদনা, যে সাম্প্রদায়িক জিগির এবং কাশ্মীর নিয়ে দু-দেশের মধ্যে যে 'দেখ্ লেঙ্গে' হুঙ্কার তার মধ্য দিয়ে। ডেটারেন্সের ধুয়ো তুলে এই অস্ত্রের পক্ষে সওয়াল করছে যারা তারা চাইলেও এই অস্ত্রের ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর নয়া দিল্লী বা ইসলামাবাদ কোনো তরফকেই সংযত বা দায়িত্বশীল আচরণে বাধ্য করাতে পারবে না। নিউক্লিয় অস্ত্র দিয়ে স্থায়ীভাবে ডেটারেন্সের আশা করা বিপজ্জনকভাবে অবাস্তব। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে এই 'ডেটারেন্স' পূব ও পশ্চিমের মধ্যে নিউক্লিয় যুদ্ধ ঠেকিয়েছে। কিন্তু অন্তত একশো বার ভুলক্রমেই নিউক্লিয়

এদেশের পরমাণু কর্মকাণ্ডের অমানবিক দিকগুলো সম্পর্কে এক নাগাড়ে বলে আসছেন যারা প্রফুল বিদোয়াই তাদের অন্যতম। এজন্য তাকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে অতীতে। পরমাণু বোমা নিয়ে যে 'মিথ' গুলো প্রচলিত রয়েছে আমাদের চারপাশে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন তিনি এই লেখায়। Regaining Nuclear Sanity লেখাটি 4 জুনের টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার মুম্বাই সংখ্যা থেকে সংগৃহীত। বাংলায় অনুবাদ করেছেন রবীন চক্রবর্তী।

যুদ্ধের মতো জরুরী সংকেত বেজে উঠেছিল সেই পর্বে, পরস্পরের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য সব ধরণের চেষ্টা অব্যহত থাকা সত্ত্বেও।

এই ভূখণ্ড, যা অজস্র টানাপোড়েন ও বিবাদে জর্জরিত, সেখানে ডেটারেন্সের ওপর নির্ভরতা আত্মহত্যার সামিল। অস্ত্রহীন অবস্থায় যদি ডেটারেন্স কাজ না করে তাহলে অস্ত্র-সজ্জিত অবস্থায় কাজ করবে কিভাবে? ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিউক্লিয় সামরিকীকরণের দুয়ার খুলে দিল, তার সাথে কাশ্মীর নিয়ে বিবাদ আন্তর্জাতিক ইস্যু হয়ে উঠল। যে বিপদকে ভারত ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে, এ-পরীক্ষা তাই উল্টে বিঘ্নিতই করল ভারতের নিরাপত্তাকে।

নিউক্লিয় নীতির অনুপস্থিতি

বর্তমান অবস্থায় পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা করেও সামাল দেওয়া সম্ভব নয় পরিস্থিতি ;আরও অসম্ভব হবে তা যদি হয় অস্ত্রধর দেশগুলোর কাছে শর্ত সাপেক্ষে। কেন সেই দেশগুলো মাথা ঘামাবে ভারতের দেওয়া শর্ত নিয়ে, বিশেষ করে তারা যখন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে পরীক্ষা বন্ধের? এর থেকেই প্রমাণ হয় নীতির ব্যাপারে কোনো রকম আগাম ভাবনা ছাড়াই ভারত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই পরীক্ষার কাজে। এই মুহূর্তে সরকারের তরফে নিউক্লিয় বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো মতামত (doctrine)-এর আভাস মিলছে না। তা না হলে সরকারি ঘোষণায় এমন এলোমেলো পরিবর্তন দেখা যেত না। শ্রী বাজপেয়ী বলেছিলেন নিরাপত্তার জন্যই আমাদের এই অস্ত্র এবং আক্রমণ সম্ভাবনা আগাম নির্মূল করার জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে এই অস্ত্র। এরপরেই আবার'প্রথম ব্যবহার না করার' ঘোষণা করেন তিনি। এবং তারপরে ফের নানান শর্তের আড়ালে ডুবিয়ে দেন এই ঘোষণা।

নীতির দিক থেকে এই শূন্যতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে একদিকে যেমন বিজেপি-র নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সহমত নেই। অন্যদিক দিয়ে পরমাণু বোমা নিয়ে তাদের পাগলামি, যেটা তারা সেই 1951 সাল থেকে মনে মনে পোষণ করে আসছে সেটা কোনো রকম নিরাপত্তার ভাবনা থেকে নয়, নিছক বিশ্বাস বশেই করে আসছে। এটার উৎপত্তি হয়েছে গান্ধীর 'অহিংস' নীতিকে অক্ষমতা-র নামান্তর বলে গণ্য করার ফলে। সাভারকার এবং গোলওয়াকারের বিশ্বাস ছিল হিন্দুদের একত্র করার সাথে সাথে তাদের অস্ত্র-সজ্জিত করে তোলাও একান্তভাবে জরুরী কাজ। তাই ভারতের হাতে যে এই অস্ত্রের অধিকার পুরুষবাদী জাত্যাভিমানের দ্যোতক হয়ে উঠেছে সেটা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। শ্রী বাজপেয়ী যুদ্ধবাদী পৌরুষের অবয়বে নিউক্লিয় মোড়ক সংযোজিত করলেন। এটা আর আশ্চর্যের বিষয় নয় যে অশোক সিংহল এবার চাইবেন ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করা হোক। নিউক্লিয় অস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে নতুন এক 'শক্তি'র বোধ যুক্ত হয়েছে এদের মনোরাজ্যে, যার ফলে মরু এলাকার তেজস্ক্রিয় বালিও পুজোর যোগ্য বলে মনে হচ্ছে এদের কাছে।

হরেক মিথ

এই বিশ্বাসে যেমন একদিকে কঠিন বাস্তবকে আড়াল করতে সাহায্য করছে তেমনি

অন্যদিক দিয়ে বিচিত্র সব মিথ-এর জন্ম দিয়েছে। চারটে মিথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম : এই পরীক্ষা এক 'বিরাট বৈজ্ঞানিক সাফল্য'। মানুষ মারার যন্ত্রের মধ্যে অনৈতিকতার যে ব্যাপার জড়িয়ে আছে সেটাকে যদি আপাতত আলাদা করেই দেখা হয়, তথাপি এই পরীক্ষা কোনোভাবেই যুগান্তকারী কোনো আবিষ্কার নয়। ফিশন ও ফিউশন বোমার বিজ্ঞান জানা রয়েছে 1945 এবং 1952 সাল থেকেই। টেলর ইত্যাদি 16 জনের এই কাজগুলি গত কয়েক দশক ধরেই জানা সবার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্ররা একসময়ে গ্রাজুয়েট স্তরে এই নিয়ে থিসিস লিখেছে। পোখরান-II সেই ধরণের প্রযুক্তির পুনরাবৃত্তি মাত্র। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের সাম্প্রতিক থার্মোনিউক্লিয়ার ডিভাইস বা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের যথার্থতা সম্পর্কে এদেশের কিছু বিজ্ঞানী এবং বিদেশের নিউক্লিয় বোমার ডিজাইনার কয়েকজন সন্দেহ প্রকাশ করে কিছু কিছু মন্তব্য করেছে (*The New York Times*, 18.5.98)। সাধারণত হাইড্রোজেন বোমা যেধরণের বিস্ফোরণ-ক্ষমতা সম্পন্ন হয়, যেমন 1000 কিলোটন তো বটেই, সাম্প্রতিক ভারতে পরীক্ষিত বোমাটির সাথে (45 কিলোটন) তার তুলনাই হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষিত প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটি ছিল 10,000 কিলোটনের। চীনেরটি ছিল 3,300 কিলোটনের। কেন এখানকার বোমাটির বিস্ফোরণ মাত্রা এত কম হল তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি সরকারী তরফে। এছাড়াও বহুদিন ধরে চালু গপ্পটি যে 1974 সালের ভারতের প্রথম বোমাটির বিস্ফোরণ ক্ষমতা যা দাবী করা হয়েছিল সেই 10 থেকে 20 কিলোটনের মধ্যে ছিল না, ছিল 2 থেকে 4 কিলোটন মাপের, তারও কোন জবাব দেওয়া হয়নি কখনও।

অন্য আর একটি মিথ এই যে চীনের বোমার ব্যাপারটা যেমন সারা পৃথিবী তখন মেনে নিয়েছিল, ভারতেরটাও তেমনি মেনে নিয়ে সব ভুলে যাবে। কিন্তু চীনের সেই বোমা এসেছিল পরমাণু অস্ত্র-সম্প্রসারণের পর্বে যখন এটা রোধ করার জন্য কার্যকর কোনো চুক্তি ছিল না। আর সেটাকে মেনে নেওয়া হয়েছিল ঠান্ডা যুদ্ধ-পর্বে চীনের বিশেষ অবস্থানের কারণে। ভারত এখন হঠাৎ নিউক ক্লাবে ঢুকতে চাইছে যখন পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করছে নিউক্লিয়ার বিরোধী রাজনৈতিক ও আইনী বিধানের আবহাওয়া এবং যখন নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো আশঙ্কা ছাড়াই করা হয়েছে এই কাজ। চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র এবং প্রযুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি বেড়েই চলেছে ঠিকই। কিন্তু কেউ যদি সম্প্রতি চীনা প্রতিনিধিদের ভারত ভ্রমণের সময় তাদের কথাবার্তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন তো তিনি জানেন যে, চীনের তরফ থেকে পাকিস্তানের মতো ভারতকেও নিউক্লিয় এবং মিসাইলের সরঞ্জাম বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল!

তিন নম্বর মিথ : আমাদের অর্থনীতি দারুণ পোক্ত। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সরাসরি আঘাত সীমিত হলেও, নানারকম ঋণপ্রকল্প বাতিল হওয়ায় ক্ষতি অনেক হবেই। সব থেকে বড় ক্ষতি হবে বিনিয়োগের ওপর এর প্রভাবের কারণে। এমনিতেই আমাদের অর্থনীতি টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে : হঠাৎ করে কয়েক হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ যদি উঠিয়ে নেওয়া হয় তো ভারত সেই 1991 সালের মতো গভীর গাড্ডায় পড়তে বাধ্য হবে। নৈতিক দিক থেকে দেখলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনোই অধিকার নেই এই নিষেধাজ্ঞা জারির, কারণ নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে কোনোই আগ্রহ নেই তাদের। সেই রকম

বাজপেয়ি সরকারেরও কোনো অধিকার নেই এই ধরণের অ্যাডভেঞ্চারের পথে যাওয়ার। পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন এবং সংরক্ষণ প্রচণ্ড ব্যয়বাহুল ব্যাপার। চীন ভেবেছিল এই খাতে ব্যয় একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারবে। কিন্তু তাদের এই ব্যয় দশ হাজার কোটি ডলার ছাপিয়ে গেছে। এই অস্ত্র বানাতে গেলেই এর সাথে যুক্ত হয় ব্যয়বহুল নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা, যার পেছনে খরচ লাগে গোটা প্রকল্পের খরচের অর্ধেকটাই। এটা মনে করার অর্থ এই নয় যে, এই পথে অস্ত্র-দৌড় থেমে যাবে। এই থামার ব্যাপারটা আর ভারতের নিজের হাতে থাকছে না। যেটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে চীনের সাম্প্রতিক ঘোষণায় যে সে ভারতকে 'থ্রেট' মনে করছে। ফলে এই ব্যাপারে ত্রিশ বছর এগিয়ে থাকার সুযোগ এবং তার ভারতের তুলনায় তিন গুণ বড় অর্থনীতির সুযোগ সে নেবে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করায়। কম করে ধরলেও ভারতকে এখন ন্যূনতম 'ডেটারেন্স' বজায় রাখতে গেলেও তার প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে করতে হবে পঁচিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ -- যখন এই ব্যয় কমানোটাই সব থেকে জরুরি ছিল। এখনই ভারত তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণ খাতে যা ব্যয় করে তার দ্বিগুণ খরচ করে প্রতিরক্ষা খাতে। এই খরচ বাড়ানো মানে দরিদ্র জনসাধারণের ওপর দুর্দশার বোঝা আরো বাড়ানো।

গভীর হতাশা

চতুর্থ মিথ : নিউক্লিয় অস্ত্রের পক্ষে দেশের বেশিরভাগ অংশ মানুষের সমর্থন আছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, এই ধরণের সমর্থনের কোনো অবস্থাই নেই এদেশে। বেশিরভাগ ভারতবাসী জানেই না হিরোশিমায় কি ঘটেছিল বা পরমাণু বোমার আসল প্রকৃতি কি ধরণের অথবা এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনোরকম প্রতিরোধ-ই সম্ভব নয়। প্রাথমিকভাবে সহমতের যে আভাস মিলেছিল তাও ক্রমে উঠে গেছে। বামপন্থী, মধ্যপন্থী এমন কি কংগ্রেস দলেরও অনেকেই নিউক্লিয় অস্ত্রের এই প্রস্তুতির বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। 125 জনের মতো বিজ্ঞানী, যাদের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি বিভাগের কর্মীরাও আছেন, যারা এই অস্ত্রের ব্যাপারে তাদের আপত্তি ও অসন্তোষের কথা জানিয়েছে। নিউক্লিয় যুদ্ধের আতঙ্ককে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারা প্রশ্ন রেখেছেন যে, আমরা কি এমন একটা পৃথিবীতে নিজেদের সুখী বা নিশ্চিন্ত ভাবতে পারি যেখানে পৃথিবীর সমস্ত দেশই তাদের নিজ নিজ নিউক্লিয় অস্ত্রের জন্য গর্ব বোধ করছে এবং সকলেই ডেটারেন্সের দোহাইতে আস্থা স্থাপন করে রয়েছে? গত পঞ্চাশ বছর ধরে নয়া দিল্লীর কাছে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল — 'না'। যেটাকে আজও বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে হয়। তাই আশা করব, আবারো যেন এই বোমার পরীক্ষা না হয়। বোমা না বানানো হয়। — এই কাজ যেমন অনৈতিক এবং বেআইনী, তেমনি কৌশলগত দিক থেকেও বেঠিক।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ

মতামত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র পক্ষ থেকে বিস্ফোরণ-পরবর্তী সময়ে জনা দশেক তরুণ-তরুণীর কাছে মতামত-ভিত্তিক লেখা চাওয়া হয়। এরা কেউই পরমাণু-বিশেষজ্ঞ নন, এমন কি নিয়মিত লেখকও নন। ব্যক্তি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ শর্ত ছিল। যেমন — বয়স হতে হবে 25 থেকে 28 বৎসরের মধ্যে ; প্রথাগত বিদ্যা ন্যূনতম স্নাতক হওয়া চাই। এরা বিস্তৃত গবেষণা করে তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবেন, এ আশা বা দাবি ছিল না। এই নবীন প্রজন্মের (সাত দশকের গোড়ায় যাদের জন্ম) মতামত জানাটাই ছিল উদ্দেশ্য। জুনের একদম গোড়ায় এদের লিখতে বলা হয়েছিল। প্রথমে বিস্ফোরণ-পরবর্তী উত্তেজনায় সকলেই লিখতে প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তেজনা থিতিয়ে আসতেই উৎসাহ উধাও অনেকের। শেষপর্যন্ত মতামত লিখে জমা দিয়েছেন পাঁচজন।

এদের কাছে চারটি প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছিল। একেবারে কড়ায়গণ্ডায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা বলা হয় নি। প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে নিজের লেখাটি তৈরি করতে বলা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, স্থানাভাবের কারণে, লেখাগুলিকে খানিক সংক্ষেপিত করা হয়েছে। প্রশ্নগুলি ছিল এই ধরণের। 1. ভারতের সাম্প্রতিক পারমাণবিক বিস্ফোরণকে সমর্থন করেন? এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের বিস্ফোরণ সম্পর্কেও মতামত দিতে পারেন। 2. সম্প্রতি ভারতের এই বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পিছনে কী কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন? 3. এই বিস্ফোরণের কী কী ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বা হবে বলে মনে করেন? 4. যদি, ভারত সম্প্রতি এই বিস্ফোরণ না ও ঘটাত, তবু তো গত কয়েকদশক ধরে সরকার পরমাণু শক্তির চর্চা করেই চলেছে। আপনি কি ভারতের এই পরমাণু শক্তি চর্চাকে সমর্থন করেন?

।। এক ।।

অনিমেষ মজুমদার
ঠিকানা—বোড়াল, দক্ষিণ 24 পরগণা।
বয়স—28 বছর।
পেশা—ব্যবসা।

1. ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি প্রদর্শনের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে এবং পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাস করতে চাই বলে, এই ধরণের কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা করি। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো সত্যিই নিন্দাজনক ও গর্হিত কাজ তা সে ভারত, পাকিস্তান বা অন্য যে কোনো দেশই ঘটাক।
2. ভারতের এই বিস্ফোরণ ঘটানো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিগত কয়েক বছরেও এমন কোনো ব্যাপার ঘটেনি যে, যাতে মনে হতে পারে ভারতের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। বিভিন্ন রাজনৈতিক অভাব-অভিযোগ, সরকারের শরিকী বিবাদ ও সর্বোপরি সরকার টিকিয়ে রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।
4. বিস্ফোরণের শারীরিক প্রতিক্রিয়া তো পোখরানের লোকজন ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন। আর অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেশের জনসাধারণ এখনো বুঝতে না পারলেও আগামী বছরে বুঝতে পারবেন যা স্বয়ং অর্থমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে উদ্‌গ্র জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদীদের উত্থান যা সবচেয়ে ভয়ংকর ও চিন্তার ব্যাপার।
4. বিশ্ব জুড়ে যে শক্তির সংকট চলছে তাতে পরমাণুর নিয়ন্ত্রিত বিভাজনে বিপুল পরিমাণ শক্তির যোগান দিতে পারে যা থেকে শক্তির সংকট অনেকটা হ্রাস পাবে। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরমাণু শক্তি চর্চাকে সমর্থন করি।

।। দুই ।।

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়
ঠিকানা—মেদিনীপুর শহর।
বয়স—28 বছর।
পেশা—চাকুরি।

1. আমি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে সমর্থন করি না।
2. বোমা বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত বর্তমান বি. জে. পি. সরকার গ্রহণ করেছেন বিশেষ কতগুলি কারণে। কারণগুলি হলো :—
   ক) বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (যাদের রাজনৈতিক ফ্রন্ট হচ্ছে বিজেপি)

উদ্‌গ্র জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সারা দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চায়। তারই হাতিয়ার হিসাবে বোমা বিস্ফোরণকে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কিনা বি. জে. পি. জোট সরকারের শরিকী অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং উদার অর্থনীতির কাছে বি. জে. পি-র নতিস্বীকার বি. জে. পি. সরকারের জনপ্রিয়তাকে ম্লান করেছে।

খ) বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বৈরিতার সম্পর্ক সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হবে তার মধ্যে দিয়ে বি. জি. পির মেকি মার্কিন বিরোধিতা প্রচার করা সম্ভব হবে, এবং এই ফাঁকে অর্থনৈতিক উদারনীতির রাস্তায় ভারতের অর্থনীতিকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে।

গ) ভারতবর্ষের দেশীয় শিল্পের অস্বাভাবিক মন্দা চলছে। অন্যান্য দেশের মতো তারাও দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে বিনিয়োগ করতে চায় যা অত্যন্ত লাভজনক। বোমা বিস্ফোরণ করে দেশের প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করা হচ্ছে, এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে দেশীয় পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের অংশ পরমাণু বিস্ফোরণের পর 10 থেকে 30 শতাংশ করা হয়েছে।

3. পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল নিম্নরূপ :—

ক) সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ ঘটনার নিন্দা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জার্মানি, ফ্রান্স সহ জি-8 গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য অনেক দেশ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় সামিল হয় নি।

খ) ভারত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে একটা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করল।

গ) ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের অনুসৃত বিদেশনীতি যা ভারতকে সারা বিশ্বের কাছে এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার প্রত্যাখানের মধ্য দিয়ে দেশের যথেষ্ট সম্মানহানি হয়েছে।

ঘ) ভারতবর্ষের জোট নিরপেক্ষ-নীতি এবং শান্তির বার্তাবাহক হিসাবে ভারতের ভূমিকা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু যুদ্ধবাজ ভারত হিসাবে আমাদের দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী যা সমাজে উগ্রতা এনে দেবে।

4. বোমা বিস্ফোরণ না ঘটনোর সিদ্ধান্ত, যা 24 বছর ধরে অনুসৃত হচ্ছিল তা সঠিক বলে আমার মনে হয়। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় আলোচনা করা দরকার :

ক) পাকিস্তান বা চীনের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যখন উন্নতির পথে তখন তারা ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে এ বক্তব্য সঠিক নয়।

খ) বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট সম্মান দিয়েই বলতে চাই যে, বিজ্ঞান মারণাস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ঔৎসুক্য বিজ্ঞানীদের বর্জন করা উচিত।

॥ তিন ॥

ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়,
ঠিকানা—মধ্যমগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগণা।
বয়স—27 বছর।
পেশা—চাকুরি।

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক পরমাণু বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর সিদ্ধান্তকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমার ধারণা এই সিদ্ধান্ত ভারত সরকারের আরও আগেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। সাম্প্রতিকতম এই বিস্ফোরণগুলির আসল নায়ক পর্দার আড়ালে থাকা পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক, রাজনৈতিক স্তরে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যেত। অন্তত এটা প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমান এক মেরু বিশ্বে বাইরের প্রবল চাপ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা স্বঅর্জিত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মানের ফলাফল অর্জনে সক্ষম।

1974 থেকে 1998 পর্যন্ত এই চব্বিশ বছরে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসা প্রত্যেকেই পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের গবেষণা চালিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য কৃতিত্বের ভাগী। বরং তারা বিভিন্ন চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রেখেছেন। সুতরাং বোমা বিস্ফোরণের কৃতিত্বের জন্য বি জে পি-র একক কৃতিত্বের দাবি যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই জানতেন না বলে বিরোধীদের দাবিও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে, 1945 -এ হিরোশিমা ও নাগাসাকির পর এই বোমা আর কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নি। একথা ঠিক। কিন্তু 1945-এর পর এই বোমা 2000 বারেরও বেশিবার ফাটানো হয়েছে এবং স্বীকৃত পরমাণুশক্তিধর রাষ্ট্রগুলির হাতে বেশ কয়েক হাজার পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে। এই স্বীকৃত পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশ তাদের পারমাণবিক অস্ত্রাগার ধ্বংস করতে চায় না, চায় না পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণা বন্ধ করতে। অথচ তারা চায়, এই পাঁচটি দেশ ছাড়া অন্য কেউ যেন পরমাণু বোমা না ফাটায়, এমনকি এই ক্ষেত্রে অন্য দেশকে গবেষণা চালিয়ে যেতে দিতেও নারাজ। এই উদ্দেশ্যে তারা তৈরি করেছে এনপিটি এবং সিটিবিটি-র মতো বৈষম্যমূলক চুক্তি। বিভিন্ন দেশকে চাপ দিয়ে এই চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করার এক অদ্ভুত বিশ্ব রাজনীতি তারা চালাচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্যকেও তারা এই চুক্তি দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে। অথচ লক্ষণীয়, এই পাঁচটি দেশ কিন্তু একসঙ্গে পরমাণু শক্তিধর হয় নি। এটা বোধহয় বলা যায়, শক্তিধর হলে তবেই একমাত্র দরাদরিকে নিজের সপক্ষে নিয়ে আসা যায়। বিশ্বের প্রতিটি দেশই যদি পারমাণবিক শক্তিধর হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সুযোগ থাকত না।

বর্তমান বিশ্বে চার ধরণের দেশ দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, 'জগা-খিচুড়ি'-তান্ত্রিক (ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মিশেলে গঠিত) এবং রাজতান্ত্রিক (সামরিক সহ)। এই চার ধরণের মতবাদীরা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রধানত তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ মতাদর্শে চালিত দেশগুলির অধিকাংশই নিজেদের সুবিধামতো প্রথম ও দ্বিতীয় মতাদর্শের শক্তিধর দেশগুলিকে সমর্থন করে। অথচ কেউই ভাবে না, যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে পৃথিবীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে। সুস্থ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির যে কোনো মানুষই চাইবে সম্পূর্ণ পরমাণু অস্ত্র মুক্ত পৃথিবী। ভারত রাষ্ট্রের দাবিও তাই। পরমাণু বিস্ফোরণের পরও এই নীতি পরিবর্তিত হয় নি। কিন্তু মাটির পৃথিবীতে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি কোনো দেশ পরমাণু শক্তিধর হয়ে উঠে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের অবস্থানকে কিছুটা সুদৃঢ় করতে চায় তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। 2000 বোমা যদি 2005 হয় এবং পরমাণু শক্তিধর দেশের সংখ্যা যদি পাঁচ থেকে 100 হয় তবে বোধহয় পৃথিবী আরও দ্রুত পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের দিকে এগোবে। সূর্যের অফুরন্ত শক্তির উৎস এই পারমাণবিক বিস্ফোরণই। সুতরাং পরমাণু শক্তির গবেষণা পৃথিবীতে কোনোওদিনই শেষ হবে না এবং তা নিষিদ্ধও হবে না। নিষিদ্ধ করা দরকার এই গবেষণাকে অস্ত্রের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ। সার্বিকভাবে এবং অবিলম্বে।

সাম্প্রতিক পরমাণু বিস্ফোরণের কুফল প্রসঙ্গে তুলে ধরা হচ্ছে আমেরিকার, জাপানের নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের মদতপুষ্ট বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্যের কর্মসূচী বাতিল করার বিষয়গুলিকে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বাকি দেশগুলি কেউই কিন্তু নিষেধাজ্ঞা চাপায় নি। বরং তারা আমেরিকার এবং জাপানের অনুপস্থিতির সুযোগে ভারতের সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছে। আর আমেরিকার ও জাপানের কঠোর মনোভাব ইতিমধ্যেই নমনীয় হতে শুরু করেছে। কারণ ভারতের এতবড় বাজারকে তারা দীর্ঘদিন অবহেলা করতে পারবে না। বরং এদের প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশীয় প্রযুক্তি এই সুযোগে নিজেদের সুদৃঢ় করার বিষয়ে আরও সচেষ্ট হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাজারে জিনিসপত্রের দাম বিস্ফোরণের ফলে বাড়ে নি। বেড়েছে অপর্যাপ্ত ফলন, মজুতদারি, কালোবাজারি এবং অকর্মণ্য রাজনৈতিক নেতাদের জন্য। আর ভারতীয় বিস্ফোরণের জবাবে পাকিস্তান যে জবাবী বিস্ফোরণ ঘটায় তা বোধ হয় ভারতীয় উপমহাদেশে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা ডেকে না এনে বিশ্ব কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে।

পাকিস্তান-ই প্রথম ইসলামী দেশ যারা পরমাণু প্রযুক্তি হস্তগত করল। ইসলামী দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র চলে যাওয়ায় রণনৈতিক দিক থেকে বিভিন্ন পশ্চিমী দেশ এই বার একজোট হয়ে পশ্চিমী পরমাণুঅস্ত্রধর দেশগুলিকে চাপ দেবে সার্বিক নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে এগোবার জন্য।

॥ চার ॥

অভিজিৎ দাস,
ঠিকানা—কসবা, কলকাতা।
বয়স—26 বছর।

1. পারমাণবিক বিস্ফোরণ, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে পরমাণু ক্ষমতার দ্বারা টেক্কা দেবার প্রয়াস, কখনওই সমর্থনযোগ্য নয়। দুই দেশের ক্ষেত্রে এই বিস্ফোরণ, ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষে অনুকূলে যেতে পারে, কিংবা জনসাধারণের কাছে ইমেজ তৈরিতে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়ার ব্যাপার নেই।
2. নানা রাজনৈতিক কারণে বিজেপি এখনও দিল্লিতে ভাল একটা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে নি। হয়তো পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে একদিকে যেমন সংবাদ মাধ্যমগুলো বিজেপি ও তার শরিক সংগঠনগুলোর আভ্যন্তরীণ কেচ্ছা ভুলে গিয়ে, পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আলোচনা বেশি করে চালাতে পারবে, আবার অন্যদিকে আঞ্চলিক দলগুলো হঠাৎ করে বিজেপি-র বিরুদ্ধে সমর্থন প্রত্যাহারের হুমকি দেওয়ার সাহস পাবে না। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের এক বিরাট অংশও উগ্র জাতীয়তাবাদ বা অপ-জাতীয়তাবাদের শিকার হয়ে এমনটাই বলবে — আহা, বিজেপি-র কি অপরিসীম ক্ষমতা। ওরা মুখে যা বলে, কাজেও তাই করে। মূলত বিজেপি-র রাজনৈতিক অবস্থা এতে অনেক অনুকূলে এসে যাবে।
3. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগুলি মিসাইল কিংবা পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে যতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উন্নতি ঘটাক, অন্য দেশে প্রয়োগ করার দুঃসাহস বা দুর্বুদ্ধি কোনো দেশের হয় নি। আমার মনে হয় না, ভারত কিংবা পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও সেটা করা কখনই সম্ভব। কারণ, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে দাবি করা হয়তো কোনো দেশের পক্ষেই আজ আর বিশেষ কোনো ব্যাপার বলে মনে হয় না। সে কারণে নতুন করে আমেরিকা কোনো দেশকেই পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসাবে বিবেচনা করতে রাজি নয়।

   পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। ভারত এবং পাকিস্তানের বৃহৎ বাজারের মোহ কার্যত পরিত্যাগ করা যে-কোনো দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তবে বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র মনে হয়। অন্যদিকে সমস্ত সরকারি ঘোষণাই যে কার্যত পালন করা হয়, সেটাও তো নয়!
4. একটা অনুমান করা যেতে পারে — যদি ভারত এই বিস্ফোরণ না ঘটাত? আসলে আমার খুব আশ্চর্য লাগে, বিভিন্ন উপগ্রহ মাধ্যম যখন এত সক্রিয়,

বিদেশী এবং দেশী প্রচার মাধ্যম, বিবিসি-র মতো মিডিয়া থাকা সত্ত্বেও ভারত চুপিসাড়ে এত বড় একটা কর্মকাণ্ড ঘটাল কিভাবে? আসলে ভারতের এই পরমাণু বোমা বানাবার কর্মকাণ্ডে বিদেশী নানা শক্তির সাহায্যও তো আছে। গত কয়েক দশকে ভারতের পরমাণু শক্তি চর্চাতে রাশিয়াসহ ইওরোপের বহু দেশের মদত রয়েছে। আমি শান্তিপূর্ণ পরমাণু চর্চার বিরোধী নই।

॥ পাঁচ ॥

মালবিকা সেনগুপ্ত,
ঠিকানা—দমদম, কলকাতা 700 030।
পেশা — শিক্ষকতা।

পরমাণু বোমা ফাটিয়ে দেশ গৌরবান্বিত হলো — অনেক পত্র-পত্রিকাতে ব্যাখ্যা মিলল — কিভাবে দেশ বিজ্ঞান-কারিগরিতে এক ধাপ এগিয়ে গেল — কিভাবে দেশের তথা আমাদের নিরাপত্তা বাড়লো ইত্যাদি। গভীর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এবং পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবিতার সপক্ষেও যুক্তি দেখানো হলো অনেক।

কিন্তু এই যুক্তি তর্ক একজন নারী হিসেবে — মা হিসেবে আমার হৃদয়ে সাড়া জাগায় না। একজন মা সবসময় স্বপ্ন দেখে একটি সুস্থ সুন্দর মানুষ গড়ে তোলার। তার জন্য ব্যয় করে তার সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য, ইচ্ছে, চেষ্টা ও ভালবাসা। তাই এই ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার — যা কিনা লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে নিমেষে নিঃশেষ করবে — যার প্রভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিরপরাধ মায়েরা জন্ম দিতে বাধ্য হবে তেজস্ক্রিতায় পঙ্গু অসংখ্য শিশুর, সেই হাতিয়ার তা সে যত উচ্চ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ধারকবাহক হোক না কেন তা বানিয়ে কিভাবে গৌরবান্বিত হওয়া যায় তা আমার বোধের অগম্য।

আমার মনে হয় আমরা প্রতিটি মানুষ যতদিন না প্রকৃত অর্থে অন্তর থেকে যুদ্ধকে ঘৃণা করতে পারব, ততদিন আমরা এই হিংসাত্মক প্রতিযোগিতার খেলায় মত্ত থাকব। এবং এরকম ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার বানিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করব — যা কিনা আসলে সম্পূর্ণভাবে মানব জাতির তথা মানব সভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা জেনেও ভাবি, এই ধ্বংসের শিকার হবে অন্য দেশ — অন্য কেউ। আমি নই — আমরা নই। আমরা অন্য দেশের সাধারণ মানুষকে আমার মতো একজন, তাঁর সন্তানকে আমার সন্তানসম ভাবতে পারি না। আমার ভয় হয় আমরা বোধহয় পিছিয়ে যাচ্ছি — ভুলে যাচ্ছি মানুষ মানুষের শত্রু নয়। মানুষই মানুষের একমাত্র বন্ধু। আমি মনে করি একজন মানুষের শুধু, মানসিকভাবে এই পারমাণবিক বোমার সপক্ষে থাকা মানেই, খুব ক্ষুদ্রভাবে হলেও কোনো এক ভয়ংকর ধ্বংসের জন্য দায়ী থাকা।

হিরোশিমা ফিরে দেখা

মানবেতিহাসের সব থেকে কলঙ্কজনক অধ্যায় সম্ভবত হিরোশিমা নাগাসাকির ঘটনা। সেই ধ্বংসকাণ্ডের নায়করা হয়তো বেঁচে নেই আজ— কিন্তু সেই ধ্বংসের চিহ্ন টিকে আছে আজও এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ বেদনার হলেও তাই প্রয়োজনীয় কারণ, সেই খুনেদের বংশধরেরা অবলুপ্ত হয়ে যায় নি আজও। সুতরাং সজাগ থাকতে ফিরে ফিরে স্মরণ করতে হবে বৈকি সে ঘটনা।

প্রথম পারমাণবিক বোমাটি

হিরোশিমায় পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল 1945 এর 6 আগস্ট। একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে মার্সেল জুনো (M. Junod) সেখানে গিয়েছিলেন 9 সেপ্টেম্বর — তেত্রিশ দিন পরে। জুনো ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রশ-এর প্রতিনিধি। তাঁর শোনা এবং দেখা সেদিনকার হিরোশিমার বর্ণনা দিয়েছেন 'The First Atom Bomb' শীর্ষক রচনাংশে। বিগত তেরো-চোদ্দ বছর ধরে এটি পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকে পাঠ্য। পরমাণু বোমা যে কত অমানবিক ও সভ্যতা-বিরোধী তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এতে। অংশবিশেষের ভাবানুবাদ করে দিয়েছেন রবীন মজুমদার।

...'হিরোশিমা' কথাটির অর্থ হলো—'বিস্তৃত উপত্যকা'....কামুরি পর্বত থেকে উৎসারিত ওটা নদীর ব-দ্বীপে গড়ে ওঠা শহর। আয়তনের দিক থেকে জাপানের সপ্তম শহর হিরোশিমার জনসংখ্যা হলো আড়াই লক্ষ; এছাড়াও ছাউনিতে ছিল দেড় লক্ষ সেনা। ..... 19 মার্চ এবং 30 এপ্রিল হিরোশিমার উপর বোমাবর্ষণ হয়েছিল। কিন্তু তাতে শহরের ক্ষতি হয়েছিল সামান্যই।

6 আগস্ট হিরোশিমার আকাশ ছিল নির্মেঘ..... দক্ষিণদিক থেকে মৃদু বাতাস বইছিল। চারপাশে দশ-বারো মাইল পর্যন্ত সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সকাল সাতটা নয়-এ বেজে উঠল বিমান আক্রমণের বিপদ সংকেত শব্দ। চারটি আমেরিকান বি টোয়েন্টি নাইন বোমারু বিমান দেখা দিল—উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে বাঁক নিয়ে দুটি বিমান সোহো সাগরের দিকে অদৃশ্য হলো। আর দুটি বিমান শুকাই অঞ্চলের আকাশে চক্কর দিয়ে দক্ষিণদিকে বিঙ্গো সাগরের অভিমুখে দ্রুত গতিতে সরে গেল। সাতটা একত্রিশে বিপদ কেটে যাওয়ার 'অল ক্লিয়ার' সংকেত দেওয়া হলো। আপাতত আর ভয় নেই ভেবে লোকজন বেরিয়ে এল গোপন আশ্রয় থেকে; শুরু হলো দিনের কাজকর্মের উদ্যোগ।.....

হঠাৎ-ই আকাশে উত্থিত হলো গোলাপী সাদা আভায় মেশানো চোখ-ধাঁধানো আলো আর তারই সঙ্গে অনুভূত হলো একরকম অপ্রাকৃত ভূকম্পন। ঠিক তার পরে পরেই উঠল সুতীব্র তাপ ও বায়ুপ্রবাহের প্রবল তরঙ্গ—শুষে নিল

তার যাত্রাপথের সব কিছুকেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শহরের কেন্দ্রস্থলে, পথে পথে এবং উদ্যানগুলিতে হাজার হাজার মানুষ সেই তাপপ্রবাহে মুহূর্তে ঝল্‌সে গেল। তাৎক্ষণিক মৃত্যু হলো অনেকেরই ; অসহনীয় তীব্র দহন-যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অনেকে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। ঝঞ্ঝাপথে সমুন্নত যা কিছু পড়ল— দেওয়াল, বাড়িঘর, কলকারখানা এবং অন্য সবরকম নির্মাণ—সবকিছুই হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন এবং পরিণত হলো একটি আবর্জনা-পিণ্ডে; প্রবল ঝঞ্ঝা সব আবর্জনাকে ঘূর্ণিপাকে তুলে দিল উর্ধ্বাকাশে। লাইনে দাঁড়ানো ট্রেনগুলিকে খেলনার মতো শূন্যে তুলে টোকা মেরে ফেলে দিল যেন সেগুলি শক্ত ওজনদার কিছু নয়। ঘোড়া, কুকুর ও অন্যান্য জীবজন্তুদেরও মানুষেরই অবস্থা হলো। এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণার অভিঘাতে প্রস্তরীভূত হয়ে গেল জীবন্ত সবকিছু। গাছপালাও নিস্তার পেল না, বৃক্ষ জ্বলতে লাগলো উদ্দাম শিখায়, ধান গাছ হারালো সবুজতা, ঘাস পুড়ে শুকনো খড়ে পরিণত হলো।..... বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থল থেকে তিনমাইল জুড়ে সমস্ত ছোট বাড়িঘর ধুলিসাৎ হয়ে গেল যেন সেগুলি ছিল কার্ডবোর্ড। রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিট ও পাথরের তৈরি কাঠামো কিছু কিছু খাড়া রইল বটে, তবে তাদের ভিতরের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যেসব মানুষ কোনোক্রমে দূরে 'নিরাপদ'স্থানে পালাতে পেরেছিল, তারাও প্রায় সবাই বিশ-ত্রিশ দিনের মধ্যে মারা পড়ল— তেজস্ক্রিয় গামারশ্মির বিলম্বিত ক্রিয়ায়।

বিস্ফোরণের প্রায় আধঘন্টা পরে— তখনও হিরোশিমার চারপাশের আকাশ ছিল নির্মেঘ—শহরের ওপর নেমে এল সূক্ষ্ম ধারার বৃষ্টি, চলল প্রায় পাঁচমিনিট। অতিরিক্ত তাপে বাতাস হঠাৎই হাল্কা হয়ে উঠে গিয়েছিলো অনেক ওপরে, সেখানে ঠাণ্ডায় (বাতাসের জলীয় বাষ্প) জমে গিয়ে নেমে এল বৃষ্টি। তারপরেই বাতাস ধাবিত হলো দ্রুতবেগে, আগুন ছড়িয়ে দিল ভয়ঙ্কর দ্রুততায়। সন্ধ্যা নাগাদ আগুনের তেজ কমে এল এবং তারপর নিভে গেল, পুড়বার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না তখন।... 'হিরোশিমার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হলো। জাপানের অন্যতম বিশিষ্ট সার্জেন সুশুকি ছয়-সাত গজের লম্বা একটা বাড়ির দেওয়ালের অবশেষ দেখিয়ে বললেন, এখানে ছিল দুশো শয্যার একটি হাসপাতাল, আটজন ডাক্তার, কুড়ি জন নার্স এবং রোগীদের সকলেই মারা পড়েছেন—সবই একটিমাত্র পরমাণু বোমার কীর্তি।...

নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে জাপান বিজ্ঞান-সমিতির বিবৃতি

জাপান বিজ্ঞানী সমিতি (Japan Scientists' Association) জাপানের বিজ্ঞানীদের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা ও বিজ্ঞানকর্মীদের বিশ্ব সম্মিলনে-র (World Federation of Scientific Workers) স্বীকৃত সংস্থা। বিজ্ঞানের শাখাতেই JSA-এর কর্মক্ষেত্র। জাপানে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে আন্দোলন 1954 সাল থেকেই শুরু হয়েছে—যখন Science Council of Japan (JCS) এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের চেষ্টা করে। তারপর থেকে জাপানে বিভিন্ন সংস্থা বহু আন্দোলন করেছে। তাদের বিশেষ সমস্যা ছিল হিবাকুশা (Hibakusha) অর্থাৎ যারা হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমা বিস্ফোরণের ফলে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সত্যিকারের সাহায্য করা। 1980 সালে JSA জাপান তথা বিশ্বের কাছে পারমাণবিক বোমার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে সক্রিয় আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিল WFSW-এর মুখপত্র **Scientific World** *(1980 সংখ্যা 1) -এ প্রকাশিত হয়। তারই অনুবাদ এটি।*

নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপদ আর নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে, প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফিরে যাবো। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলাটা একটা নিছক অতীতের বেদনাদায়ক ঘটনা বলে আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই। এটার তাৎপর্য বর্তমানেও খুবই বাস্তব ব্যাপার।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলার প্রথম পাঁচমাসের মধ্যে দুলক্ষ (1945-এর শেষে) আর পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও এক লক্ষ মানুষের প্রাণ গেছে। শুধু তাই নয়, এর বিধ্বংসী ফলাফল এখনও চলছে। শত-সহস্র পারমাণবিক-বোমা-আক্রান্ত মানুষ (হিবাকুশা) অবশিষ্ট রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে এখনো জীবিত তিন লক্ষ সত্তরহাজার মানুষের অবস্থা প্রতিদিন আরো খারাপ হয়ে চলেছে। আর বর্তমানে, বোমা ফেলার 35 বছর পর, এখনও অনেক ব্যাপার আছে যেগুলোকে পারমাণবিক বোমার আক্রমণের ক্ষয়ক্ষতি ও ফলাফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের গ্রহণ করা দরকার ; ঠিক কতজন প্রাণ হারিয়েছে, বোমা ফেলার ঠিক পরেই বিকিরণের মাত্রার বন্টন, জেনেটিক ফলাফল, এবং মারাত্মক সামাজিক ধ্বংস ও অমানবিকতা ; বাস্তবত গোটা ছবিটা এখনও নির্ধারণের দরকার আছে। এর সাথে,

হিবাকুশাদের সত্যিকারের সাহায্য করাটাও নিশ্চয়ই যুক্ত করতে হবে। এখন যারা বেঁচে আছে তাদের শতকরা 50 ভাগ বোমা ফেলার পরে জন্মেছে, এবং এমন কি জাপানে তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা হিরোশিমা ও নাগাসাকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

আমাদের আশু-কর্তব্যের সারসংকলন করা যায় এভাবে :

জনসমক্ষে পারমাণবিক বোমার ক্ষয়ক্ষতি ও পরবর্তী তথ্য উদ্‌ঘাটন ; প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সমস্ত মানুষকে অবহিত করা ;

হিবাকুশাদের জন্য ঠিকমতো সাহায্যের ব্যবস্থা করা ; হিবাকুশাদের জাতীয় ক্ষতিপূরণের স্বীকৃতি দেওয়া ; হিবাকুশাদের জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ; এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রমুক্ত এক বিশ্বের নিশ্চয়তা তাদেরকে দেওয়া ;

প্রয়োজনীয় সমস্ত শাখার বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক ও আন্তর্বৈষয়িক সহযোগিতা দ্বারা এবং যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা দ্বারা এই কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা ও আপস-মীমাংসা হিরোশিমা ও নাগাসাকির ঘটনাবলীর সাথে যুক্ত করা উচিত। রাজনৈতিক নেতা, সামরিক বাহিনী, কূটনীতিবিদ, চিন্তাবিদদের এই মনোভাবে পুনর্শিক্ষিত করে তোলা উচিত।

সমস্ত নিরস্ত্রীকরণের বিবেচনার মধ্যে, নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণকে আমরা সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। প্রথমত, আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ; দ্বিতীয়ত, নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র, তার উৎপাদন, পরীক্ষা, সঞ্চয়, সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিস্তার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। 1978 সালে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে এই বিষয়ে যে লিপি পাঠানো হয় তাতে জাপানের এগারো কোটি জনসাধারণের মধ্যে দু-কোটির বেশি মানুষের স্বাক্ষর ছিল।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন যেমন ঘোষণা করেছে, এটা এখন স্বীকৃত যে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র গ্যারান্টি হলো নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ। নিরস্ত্রীকরণের দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন এবং প্রস্তাবিত বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মিলনকে আমরা নিশ্চিয়ই সফল করে তুলব। অন্য কোনো পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

আমরা জাপানে 'তিনটি নন্‌-নিউক্লিয়ার নীতি' বিধিবদ্ধ আইনের আওতায় আনতে চাইছি। জাপানের ভূ-খণ্ডে নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, রেখে দেওয়া বা আমদানির অনুমতি দেওয়া চলবে না। নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতকারী দেশের ভূখণ্ডের বাইরে এর বিস্তারকে কার্যকরভাবে ঠেকাতে হলে, এই একই নীতিগুলিকে আন্তর্জাতিক করে তোলার সময় এসে গেছে। ন্যাটো (NATO)-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে নতুন এক জাতের মাঝারি ধরণের নিউক্লিয়ার মিসাইল, দ্বিতীয় পারশিং (Pershing—11), নিউট্রন বোমা ইত্যাদি বিস্তারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আন্দোলনসহ ইওরোপ ও অন্যান্য দেশগুলির নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলনকে আমরা জাপানি বিজ্ঞানীরা

অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করি। এগুলিকে থামানোর সময় এসে গেছে। আমাদের খুব দেরি হয় নি। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি, এই লড়াইয়ে আমরা জিততে পারব।

আর একটা ব্যাপার বলা দরকার। অস্ত্রশস্ত্রের জন্য, বিশেষত নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বিশাল অর্থব্যয় দ্বারা মানবিক সম্পদ ও সক্ষমতা, প্রধানত বিজ্ঞানী ও কারিগরদের কাজকর্ম বিপজ্জনকভাবে নষ্ট করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অপুষ্ট বিশ্বে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর দিকে যদি একে, বা এমন কি এর অংশ বিশেষকে চালিত করতে পারা যেত, তাহলে আমরা শুধু মানবিক সম্পদের অনুৎপাদক, বাজে খরচবহুল ও বিপজ্জনক এই ব্যবহারেরই অবসান হতো তাই নয়, বরঞ্চ আমাদের ব্যর্থতায় যে বেদনাদায়ক অধ্যায় নগ্ন হয়ে পড়ছে, তাকে প্রতিহত করা সম্ভব হতো। ❑

প্রথম প্রকাশ : বিওবি, জানু-ফেব্রু '81 অনুবাদ : সৌমেন গুহ।

নিউক্লিয়ার কর্মকাণ্ডে সব কিছুই 'সিক্রেট'

গত 1996 সালের জুন মাসে ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ গোপালকৃষ্ণণ অবসর নেওয়ার পরেই সাংবাদিকদের ডেকে কিছু কথা বলেন। তিনি জানান যে ভারতের নিউক্লিয়ার কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রগুলিতে 130টির মতো গলদ চিহ্নিত করা হয়েছিল যা যেকোনো সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। মুম্বাইয়ের PUCL এই খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 1996 সালের সেপ্টেম্বরে একটি জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা করে মুম্বাই হাইকোর্টে। তাঁরা দাবি করে যে, এই ত্রুটিসংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হোক, অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট 1962-র গোপনীয়তা সংক্রান্ত 18 নম্বর নিয়মটি বাতিল করা হোক এবং ত্রুটির জন্য দায়ী অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। হাইকোর্ট অ্যাটমিক এনার্জি বিভাগকে এই অভিযোগের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য পেশ করতে বলে। উত্তরে ওই বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আর চিদাম্বরম জানিয়েছেন যে, এসব গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। তাতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। হাইকোর্টও এই অজুহাত মেনে নিয়ে PUCL-এর আবেদন নাকচ করে দিয়েছে।

সূত্র : *Lawyers Collective*, July'97

হিরোশিমা-নাগাসাকি 1945

সৌমেন গুহ

6 আগস্ট 1945 হিরোশিমা।

জাপানের সামরিক বাহিনী তাদের অতি পরিচিত আমেরিকার বি-29 দুটি বোমারু বিমান, উড়তে দেখেছিল। তারা জানত, বোমারু বিমানগুলো থেকে পড়তে পারে তাদের পরিচিত বিধ্বংসী বোমা।

কিন্তু সকাল সওয়া আটটায় পড়েছিলো 'রোগা লোক' (Thin Man) বা 'ছোট ছেলে (Little Boy) নামে তাদের অপরিচিত এক পারমাণবিক বোমা। অবিশ্বাস্য বিধ্বংসী বোমা। এক আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল পুরো শহরটা।

একটি বোমাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে হিরোশিমা শহর—এই অবিশ্বাস্য খবর ইওশিও নিশিনা-র বিশ্বাস হয়েছিল, তিনি ছিলেন জাপানের পারমাণবিক বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানী নিশিনা হিরোশিমার ধ্বংস নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, পরিমাপ করেছেন সেই ধ্বংসস্তূপে গিয়ে, দেখেছেন প্রায় 650 গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে সমস্ত কিছু প্রচণ্ড তাপে পুড়ে গেছে, গলে গেছে। তেজস্ক্রিয়তা মাপার জন্যে ঠিক বিস্ফোরণের জায়গাটি নিশিনা পরীক্ষা করেছেন। তার চার মাস পরেই বিজ্ঞানী নিশিনার শরীরে ফুটে বেরিয়েছে হিরোশিমার বোমার তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া ।

9 আগস্ট 1945 নাগাসাকি...

আমেরিকান বি-29 বোমারু বিমান থেকে ফেলা

জাপানের বৃহত্তম দ্বীপ হোন্‌শু-র দক্ষিণের কোল ঘেঁসে হিরোশিমা। শিকোকু দ্বীপ আর হিরোশিমার মাঝখানে একফালি জাপান সাগরের জলের ব্যবধান। হিরোশিমা থেকে উত্তরে দক্ষিণ কোরিয়া কাছাকাছি, পশ্চিমে চীন রয়েছে খানিকটা দূরে। হিরোশিমার নদীর বুকে আজও প্রতি বছর বেঁচে থাকা মানুষেরা জ্বলন্ত বাতি ভাসিয়ে দেয় তাদের মৃত আত্মীয়দের স্মরণ করে।

হলো 'মোটা লোক' (Fat Man) নামের পারমাণবিক বোমা, পূর্বচীন সাগরের গায়ে লাগানো শহর নাগাসাকির বুকে। সেদিন কিছুটা দূরে থেকে জীবিত থাকতে পেরেছিলেন জাপানের চিকিৎসক আকিজুকি। ড. আকিজুকি দেখেছিলেন— 'এ এক শয়তানের চিহ্ন। আমি ভাবলাম শয়তানের থাবা অনেক নীচে আর দূরে, শহরের থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছিল, চূর্ণ-বিচূর্ণ বাড়িগুলোর লোহার কাঠামো ছড়ানো ছিল পরিত্যক্ত জমির ওপর— মানুষের থেকে লক্ষ কোটি গুণ শক্তিশালী এক বিশাল শয়তানের স্বাক্ষরের মতো।'

হিরোশিমাতে বিস্ফোরিত হয়েছিল মোট 4 টন ওজনের একটি বোমা—যার ধ্বংস ক্ষমতা ছিলো প্রায় 12 হাজার টন (12 কিলোটন) টিএন টি বিস্ফোরক পদার্থের সমান।[6,3]

হিরোশিমায় 78 হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল—রাষ্ট্রসংঘের 1968 সালের রিপোর্টে প্রকাশ। কিন্তু জাপানের নিজস্ব তথ্যে 1981 সালে বলা হয়েছে[2]—হিরোশিমায় কতো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল হিসেব করা অত্যন্ত কঠিন। একটা মাঝামাঝি হিসাবেতে বিশ্বাস করা যায়, অন্তত পক্ষে দেড় লক্ষ মানুষ 1945 সালের মধ্যে হিরোশিমায় মারা গেছে, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলে।

রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বলে—27 হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে নাগাসাকিতে। জাপানের নিজস্ব তথ্য থেকে[3]—নাগাসাকির বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় 74 হাজার মানুষের, হিসেব করা যায়।

হিরোশিমা-নাগাসাকির স্বজন-হারানো-শ্মশানের তথ্যচিত্র তুলে রেখেছিল জাপানের প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকার আকিরা ইওয়াসাকি। এ কথাটা জানতে পেরেই আমেরিকার কর্তৃপক্ষ তথ্যচিত্রটির যাবতীয় অংশকে গোপন বলে ঘোষণা করে বাজেয়াপ্ত করল। প্রায় পঁচিশ বছর পরে 1970 সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, সেই তথ্যচিত্র কেটে-ছেঁটে খাড়া করা হলো 'হিরোশিমা-নাগাসাকি : আগস্ট 1945' চলচ্চিত্রটি।

আজও হিরোশিমার স্মৃতিটুকু ধরা আছে 'মিউজিয়াম্ অফ্ দ্য অ্যাটমিক্ বম্'—পারমাণবিক বোমার সংগ্রহশালায়। এখনকার তরুণ বয়সী, যারা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি মিছিলে সক্রিয়, তারা হিরোশিমাকে মনে রেখেছে। মিনেকো ওৎসুকা গান বেঁধেছে : তুমি কি শুনতে পাও না, / এতো উজ্জ্বল ক্ষুদে স্বপ্নগুলো? / তুমি কি দেখতে পাও না তাদের, / সকালের আকাশে ভেসে বেড়ায়? / ছোটো মেয়েদের স্বপ্নগুলো / যারা আর কখনো স্বপ্ন দেখতে পাবে না।

পশ্চিমের মানুষের নিউক্লিয়ার-বিরোধী মিছিলের সামনে ঝোলে, হিরোশিমার নামে নাম মেলানো শ্লোগান—'আমরা ইউরোশিমা চাই না।'

হিরোশিমা-নাগাসাকি—তারপর....

হিরোশিমা-নাগাসাকির বুকে নিক্ষিপ্ত নিউক্লিয়ার বোমার বীভৎসতা শেষ হয় নি শুধু তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়েই। নিউক্লিয়ার বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা শহরে,

প্রথম কয়েক সপ্তাহেই অন্তত 77 হাজার মানুষ প্রবেশ করার জন্য অসুস্থ হয়।

বোমা চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে মানুষ, ঘর-বাড়ি। কিন্তু ধ্বংস শেষ হয়ে যায় নি। আকাশে, বাতাসে, জমিতে, জলেতে নিঃশব্দে ছড়িয়েছে তেজস্ক্রিয়তার বিষ। নিউক্লিয়ার বোমার এখানেই বিশেষত্ব। প্রথম ধাক্কার ধ্বংসে, শেষ হয়ে যায় না তার ধ্বংসলীলা। এক সপ্তাহ বা এক বছর, দশ বছর বা তিরিশ বছর ধরে মানুষ তার বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় পদার্থের ফল বহন করে চলে। তাই ওই 77 হাজার মানুষ ছিল বোমার নিঃশব্দ পরবর্তী ধ্বংসের শিকার, ধীরে ধীরে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী এইচ. জে. ম্যুলার-এর গবেষণার অন্যতম বিষয় ছিল, জীবদেহের ওপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব—বিশেষত কীভাবে বংশপরম্পরায় সেই বিকিরণের ফল দেখা যায়। বিজ্ঞানী ম্যুলার হিরোশিমা-নাগাসাকির তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্ভাব্য ফলাফল আলোচনা করেছেন 1955-য়। ম্যুলার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—হিরোশিমার বেঁচে থাকা মানুষ যতটুকু তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছেন, তার সামান্য অংশ হলেও, সেটা তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বংশপরম্পরায় থেকে যাবে। তিনি বলেন, 'এই সিদ্ধান্তকে সন্দেহ করাটা হবে খেয়ালখুশি মাত্র'।

জেনেটিক ক্ষতির হিসাব তখনও পুরোপুরি না পাওয়া গেলেও তার চরিত্র কেমন হতে পারে, সেই প্রসঙ্গে ম্যুলার বলেছেন—'প্রত্যেক মিউটেশন (Mutation)—যদি সামান্যও হয় তার ফলাফল আর বিচিত্র জনসংখ্যার গোলকধাঁধায় যদি তা দৃষ্টি এড়িয়েও যায়—তাহলেও বংশের পর বংশে তা বাহিত হয় আর পরবর্তী সন্তান-সন্ততির জন্মে বাধা দেয়, যতক্ষণ না একজনের মধ্যে তা চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে সেই বংশ-পরম্পরা তার বংশগত অক্ষমতার কারণে শেষ হয়ে যায়। এটার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির অপরিণত বয়সে মৃত্যু হয়, বা সে সন্তান জন্মদানে ব্যর্থ হয়।'[2]

1977-এর আগস্ট মাসে জাপানে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র বসে, যার বিষয় ছিল 'হিরোশিমা এবং নাগাসাকির বোমা বিস্ফোরণের পরবর্তী ফলাফল'। এই আলোচনাচক্রে 'ন্যাচারাল সায়েন্স গ্রুপ'এর আলোচিত বিষয়টি ছিল 'হিরোশিমা এবং নাগাসাকি বোমার দৈহিক ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত ফলাফল'। জানা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধান কম হয়েছে। যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলির থেকেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রথম সপ্তাহে হিরোশিমায় প্রবেশকারীদের ওপর অবশিষ্ট বিকিরণ ক্রিয়া করেছে। সম্ভবত তাদের নিঃশ্বাস এবং খাদ্যে কিছুটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ গেছে।

রক্তের ক্যান্সার বা লিউকেমিয়ায়, বিকিরণে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর হার জাপানের অন্যান্য মানুষের তুলনায় সাত গুণ। লিউকোমিয়ার আক্রমণ সবথেকে বেশি দেখা গেছে শিশুদের মধ্যে। যদিও 10-20 বছর বয়স্ক মানুষের মধ্যে এটা কম, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের পরিমাণ বেড়েছে।

হিরোশিমা-নাগাসাকি দুই শহরের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট বেশি সংখ্যায় থাইরয়েড্

গ্রন্থির ক্যান্সার দেখা গেছে। মহিলাদের মধ্যে দেখা গেছে স্তন ক্যান্সার। ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃতের সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে।

সাধারণ জনসংখ্যার থেকেও যারা বিকিরণে আক্রান্ত তাদের মধ্যে স্যালিভারী গ্রন্থির টিউমার, গ্যাস্ট্রিক কারসিনোমা, হাড়ে টিউমার, প্রস্টেট ক্যানসার, বিপজ্জনক লিম্ফোমা ইত্যাদি অনেক বেশি।

ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা ছিল, তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আক্রান্ত প্রাণীর মৃত্যু তাড়াতাড়ি হয়—অর্থাৎ জীবনকাল কমে যায়। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ক্ষেত্রে এই গবেষণা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে করা হয় নি।

বিকিরণে আক্রান্ত মহিলাদের পরবর্তীকালে যেসব সন্তান হয়েছে, তাতে বিভিন্ন ধরণের জন্মগত বিকলাঙ্গ দেখা গেছে। বর্তমান গবেষকরা বলেন, হিরোশিমা-নাগাসাকির নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওপর বিকিরণের প্রভাব অবশ্যই অন্যান্য মানুষের ওপর বিকিরণের প্রভাব থেকে ভিন্নরকম হবে, কারণ বোমা বিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষের ওপর আরও অনেকরকম শারীরিক ক্ষতি একই সঙ্গে হয়ে থাকে।

হিরোশিমা-নাগাসাকির বিস্ফোরণের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ছাপ আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের বলা হয় 'হিবাকুশা'। এ-ব্যাপারে জাপান সায়েন্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে আশা করা যাচ্ছে, আরও গবেষণা হবে।[3]

নিউক্লিয়ার বোমার দেহতত্ত্ব ও আচরণ

প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন মৌল পদার্থ আছে, তার মধ্যে ইউরেনিয়াম অন্যতম। এর প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে যে শক্তি আবদ্ধ থাকে তা ভেঙে বাইরে আনতে পারাটা ছিল নিউক্লিয়ার বোমার লক্ষ্য। প্রকৃতিতে ইউরেনিয়াম সাধারণত দুটি শ্রেণীর হয়, ইউরেনিয়াম-235 এবং ইউরেনিয়াম-238, যার মধ্যে প্রথমটি প্রকৃতিতে খুব কম পরিমাণ পাওয়া যায়। অথচ, ইউরেনিয়াম-235 নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের জন্য সব থেকে উপযুক্ত। এর কেন্দ্রকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলবার পন্থা অনুসন্ধান ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব পারমাণবিক গবেষণার মূল লক্ষ্য। বিশ্বযুদ্ধের অগ্রগতির মধ্যে আমেরিকার ম্যানহাটন্ প্রোজেক্ট সফল হয়েছিল এই গবেষণায়। পরীক্ষামূলক বোমাটির প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে 16 জুলাই 1945-এ, অস্কিউরো গ্রামের কাছে জর্নাডা ডেল্ মুয়েতো বলে একটি এলাকায়। শেষ রাত সাড়ে পাঁচটার সময়ে বিশ্বে প্রথম নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটল প্রায় আশাতীত ক্ষমতা নিয়ে।

অপর একটি তেজস্ক্রিয় মৌল প্লুটোনিয়াম-239 যথেষ্ট সহজলভ্য। ইউরেনিয়াম-238 মৌলটিকে বিশেষ রিঅ্যাক্টর বা চুল্লিতে পরিবর্তিত করা হয় প্লুটোনিয়াম-239 মৌলতে। এই ইউরেনিয়াম-235 অথবা প্লুটোনিয়াম-239 হলো নিউক্লিয়ার বোমার মূল উপাদান। আবার, প্রকৃতিতে স্বাভাবিক যে থোরিয়াম পাওয়া যায়, তাকেও রূপান্তরিত করা সম্ভব ইউরেনিয়াম-233 মৌলতে, যেটি নিউক্লিয়ার বিভাজনের উপযুক্ত।

ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম মৌল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের কম হলে, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব নয়—একে 'ক্রিটিক্যাল্ মাস্' বলে। তবে এই পরিমাণ, অনেক যান্ত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে, বা বিশুদ্ধ মৌল ব্যবহার করে খানিকটা কমানো সম্ভব।

প্রথমদিকের নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে দেখা গেছে কমপক্ষে 16.25 কিলোগ্রাম ইউরেনিয়াম-235 বা 5.79 কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম-239 দরকার হয়।

প্রথম বিস্ফোরণের সময়কালে 13 পাউণ্ড (অর্থাৎ 5.79 কিলোগ্রামের কাছাকাছি) প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। আর তার বিস্ফোরণের ক্ষমতা হয়েছে বহু হাজার টন্ TNT বা ট্রাইনাইট্রো টলুইন বিস্ফোরণের সমান ! নিউক্লিয়ার বোমার এটি হলো প্রথম বিশেষত্ব—তার অসাধারণ বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ক্ষমতা।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব হলো, সাধারণ বোমার থেকে বহুগুণ তাপ এবং শক্‌ওয়েভ (ধাক্কা) তৈরি করা ছাড়াও, নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়তে থাকে জীবজগতের পক্ষে বিপজ্জনক বিভিন্ন রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ। আর এই তেজস্ক্রিয় পদার্থই বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং বহুদিন ধরে, বিভিন্ন জীবদেহে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্লুটোনিয়াম এবং ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছাড়াও, স্ট্রন্‌শিয়াম-90 এবং সিজিয়াম-137 মৌলের মতো বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়ায় বিস্ফোরণের পর।

মানবদেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সহ্য করার ক্ষমতার বিশেষ কোনো সীমারেখা নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের অভ্যস্ত বিকিরণ বা তার থেকে বেশি যে কোনো মাত্রার বিকিরণই, জীবকোষের সূক্ষ্মতম অংশে (বা জেনেটিক্) প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। আমেরিকার অ্যাটমিক্ এনার্জি কমিশন জানিয়েছে, 'বিকিরণের ফলে জেনেটিক্ প্রতিক্রিয়া ঘটার কোনো সহ্যসীমা নেই এবং জেনেটিক প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিকিরণের কোনো নিরাপদ পরিমাণ নেই।' ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব-পদার্থবিদ ওয়াল্টার আর. চাইল্ডের মতে, 'জীবনকাল কমিয়ে আনার প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে (বিকিরণের) কোনো সহনীয় মাত্রা নেই।'

বিস্ফোরণের পর এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণই হচ্ছে নিউক্লিয়ার 'ফল্‌আউট্'। এবং বেশ কিছুদিন যাবত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা অবশিষ্ট বিকিরণ (residual radiation) ছাড়াও অন্তত আরও দু'টি বিশেষ ব্যাপার নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণে দেখা যাবে—প্রথমত, বায়ুমণ্ডলে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলে একটি প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় কম্পন বা ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক্ পাল্‌স্ (EMP), কয়েক হাজার মাইল এলাকা জুড়ে সমস্ত ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার বা বেতার যন্ত্রাংশগুলিকে সম্পূর্ণ অচল করে দেবে। অর্থাৎ, আক্রান্ত এলাকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগের যন্ত্র বিকল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, হাইড্রোজেন বোমা জাতীয় নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ আবহমণ্ডলের রক্ষক বা ছাদ হিসাবে যে ওজোন্ (O_3) গ্যাসের স্তরটি বর্তমান, তাকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

এই ওজোন্ গ্যাসের স্তরটি মহাকাশে (অবশ্যই সূর্যেরও) অতি-বেগনি বা আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির হাত থেকে সমস্ত পৃথিবীকে বাঁচায়। কাজেই, জোনাথান্ শেল -এর গবেষণা *দ্য ফেট্ অফ্ দ্য আর্থ* অনুযায়ী বলতে হয়, হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের পরও যারা বেঁচে থাকবে, তারা থাকবে জীবনভর অন্ধত্বের গ্লানি নিয়ে। অনুন্নত যন্ত্রাংশে তৈরি হিরোশিমার বোমা ছিল চার টন ওজনের। আমাদের সমসাময়িক কালেই এখন সম্ভব হয়েছে দু'লক্ষ টন টিএন্টি-র নিউক্লিয়ার বোমা বহনকারী নিখুঁত লক্ষ্যভেদে সক্ষম যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা, যেখানে সমগ্র যন্ত্রটির ওজন 100 কিলোগ্রাম![4-6]

হাইড্রোজেন বোমা অর্থাৎ আরো ধ্বংস

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের এলুগেল্যাব দ্বীপে পরীক্ষা করা হলো বিশ্বের প্রথম 'হাইড্রোজেন' বিস্ফোরক। 'মাইক্' নামের এই দানব ফেটে পড়ল—1952-অক্টোবরের শেষ রাতে। এক মাইল ব্যাসার্ধের আর 175 ফুট গভীর এক গর্ত হয়ে গেল। সাড়ে তিন মাইল ব্যাসের এক জ্বলন্ত গোলক নেমে এলো—বিস্ফোরণে অদৃশ্য হয়ে গেল এলুগেল্যাব নামে দ্বীপটি!

এই ছিল তিন মেগাটন 'হাইড্রোজেন'-এর বিস্ফোরণ—হিরোশিমায় বিস্ফোরিত বোমার 250 গুণ—শক্তির পরীক্ষা! আমেরিকা খুশি হলো না। কারণ, এখনও প্রকৃত 'হাইড্রোজেন বোমা' তৈরি হয় নি। সেটাও তৈরি হলো দু'বছরেই। পরীক্ষার জন্য বিস্ফোরিতও হলো।

1 মার্চ 1954 বিকিনি দ্বীপে —

এই পরীক্ষামূলক 'হাইড্রোজেন বোমা' এখন 18 থেকে 22 মেগাটনের —অর্থাৎ হিরোশিমায় বিস্ফোরিত বোমার দেড় হাজার গুণেরও বেশি শক্তিসম্পন্ন। বিজ্ঞানীদের ঘোষিত 'বিপদ সীমারেখা'র অনেক অনেক বাইরে, বিস্ফোরণের 120 মাইল দূরে জাপানি মাছ ধরা স্টিমার 'লাকি ড্রাগন'-এর ওপরে নেমে এল তেজস্ক্রিয় পদার্থের ঝড়—অসুস্থ হয়ে পড়ল জেলেরা, কয়েকমাসেই মৃত্যু হলো কুবোয়ামা নামে একজনের।

অতি-ভারী মশলায় ছোট্ট বোমা

পাগ্‌ওয়াশ্ আন্দোলনের এক আলোচনাচক্রে 1970 সালে বিজ্ঞানীরা 'অতি-ভারী' (Super-heavy) মৌলপদার্থের আবিষ্কার ও তার সামরিক প্রয়োগ সম্পর্কে বলেন—নিউট্রন সংখ্যা 184 এবং 318 (যথাক্রমে পারমাণবিক সংখ্যা 114 এবং 162) বিশিষ্ট অতি-ভারী মৌলের আবিষ্কার অদূর ভবিষ্যতেই হবে—যার মাত্র 25 থেকে 520গ্রাম পরিমাণ (Critical Mass) দিয়েই নিউক্লিয়ার বোমা তৈরী হতে পারে।

প্রকাশ্য সভায় আমেরিকার বিজ্ঞানী এ. এইচ. স্টুর্টভ্যান্ট বললেন, 1954 সালের বোমা পরীক্ষার পর সম্ভবত 1800 শিশু জন্মেছে, যাদের ওপর উচ্চমাত্রার বিকিরণের প্রতিক্রিয়া আক্রমণ করেছে। প্রাণী বিজ্ঞানী কুর্ট স্টার্ন ঘোষণা করলেন—'হাইড্রোজেন বোমার বিগত পরীক্ষার ফলে, বিশ্বের সমুদ্র উপকূলের প্রত্যেক মানুষের দেহে এখন থেকে রয়ে গেল সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা, রয়ে গেল হাড় ও দাঁতে 'উত্তপ্ত' স্ট্রন্‌শিয়াম, আর থাইরয়েড গ্রন্থিতে 'উত্তপ্ত' আয়োডিন।'

বিজ্ঞানীদের হিসাবের বাইরে ছিল বিকিনি দ্বীপের বাতাসের গতি। উত্তরের পরিবর্তে দক্ষিণে বাতাস বয়ে নিয়ে গেল তেজস্ক্রিয় ভস্ম। জাপানের বৃষ্টিতে আর অস্ট্রেলিয়ার বাতাসে সেই ভস্ম ধরা পড়ল।

বাতাসে ভেসে আসে মারণাস্ত্রের নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া। বোমা বিস্ফোরণের এলাকার বাইরে থেকেও রেহাই নেই। আমেরিকার সেনেট সাব-কমিটির সামনে, সামরিক গবেষণা ও উন্নয়ন দপ্তরের জেমস্ গ্যাভিন সাক্ষ্য দিলেন 1956 সালের মে মাসে। প্রশ্ন করা হলো, রাশিয়ার বুকে নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাতাসের ফলাফল কেমন হবে। গ্যাভিনের উত্তর : 'বর্তমান হিসাব অনুযায়ী, বাতাস বয়ে যাচ্ছে কোন্ দিকে তার ওপর নির্ভর করে, যে কোনো দিকেই যাক না, বহু কোটি মানুষের মৃত্যু হবে।' দক্ষিণ-পূর্বমুখী বাতাসে জাপান, এমনকি ফিলিপাইন পর্যন্ত, আর উত্তর-পশ্চিমমুখী বাতাসে মরবে পশ্চিম ইওরোপের মানুষ। অর্থাৎ ধ্বংসের হিসাবে বাতাসের গতিও মৃত্যুর হাতছানি।[7]

মূলত, হাইড্রোজেন বোমাতে কিন্তু ব্যবহার করা হলো পুরোনো নিউক্লিয়ার বোমারই কলা-কৌশল। নতুন যা, তা হলো সবথেকে বেশি পরিমাণ ইউরেনিয়াম্ বিস্ফোরকের বিভাজনটি ঘটাবার জন্যে কিছুটা পরিমাণ হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করার তাপশক্তি কাজে লাগানো হলো এক্ষেত্রে। সেদিকে থেকে এখানে বিভাজন বা ফিশন্ প্রক্রিয়ার সাথে মিশ্রণ ঘটল সংযোজন বা ফিউশন প্রক্রিয়ার।

প্রায় বিশুদ্ধ সংযোজন বা ফিউশন্ বোমার নাম এখন 'নিউট্রন' বোমা। সম্প্রতি এই 'নিউট্রন' বোমার কার্যকারিতা সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে—এর বিস্ফোরণের মাত্রা খানিকটা কম, কিন্তু তেজস্ক্রিয় বিকিরণে মানুষের মৃত্যু হবে অনেক, অনেক বেশি।

কার্জন পার্কে এক মেগাটন

রাত সাড়ে আটটা.....

কোনো এক বছরের মেঘমুক্ত আকাশ .....

কলকাতার কার্জন পার্কের ছ'হাজার ফুট ওপরে এক মেগাটন ক্ষমতার একটি নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটল।

এ সময়ে কলকাতার প্রায় সব সিনেমা হল্-এ বিকালের ও রাত্রের প্রদর্শনীর জন্যে মানুষেরা ভিড় করেছিল। খুবই সম্ভাবনা—কলকাতার মাঠে এপ্রিল মাসের শেষে তখন

কোনো খেলা দেখে দর্শকরা সবাই এখনও বাড়ি ফিরতে পারে নি। ডালহৌসি পাড়াটা কিছুটা খালি হয়েছে, কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণে সমস্ত অঞ্চলেই বাস-ট্রামে ভীষণ ভিড়।

একবার মাত্র মুহূর্তের জন্য মানুষের চোখ ঝল্‌সে গিয়েছিল আকাশে প্রচণ্ড আলো দেখে—কিন্তু শব্দ শুনতে পায় নি। প্রথম আড়াই মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে, অর্থাৎ—ভবানীপুর থেকে তিলজলা, বেলেঘাটা, মানিকতলা, বাগবাজার আর গঙ্গার ওপারে হাওড়ার উত্তরে সালকিয়া থেকে কদমতলা, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—এই সমগ্র এলাকাটি প্রায় শব্দ শোনার আগেই একটা বিস্ফোরণের ঢেউয়ে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হলো। একটি বাড়ি বা একটি মানুষও এই প্রায় 20 বর্গমাইলে মধ্যে থাকল না, সমস্ত শহরাঞ্চল গলে-পুড়ে সমতল হয়ে গেল।

হয়তো কলকাতার পৌর অঞ্চলের লোকসংখ্যা তখন 31 লক্ষ। প্রত্যেকটি লোক বাড়ি ফিরেও এই ধ্বংস এড়াতে পারল না। কাজেই, ধ্বংসের প্রথম বৃত্তের কলকাতার মৃত্যুসংখ্যা 31 লক্ষ। আর হাওড়া জেলার সবথেকে ঘিঞ্জি অংশ যদি সমগ্র লোকসংখ্যার অর্ধেক হয়, তাহলে প্রায় চার লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলো হাওড়ায়।

কার্জন পার্ক থেকে তিন মাইলের মতো দূরত্বে যে অঞ্চলটা আছে, অর্থাৎ—তারাতলা, চেতলা, তপসিয়া, কাঁকুড়গাছি, বেলগাছিয়া আর হাওড়ার ঘুশুড়ি, বামুনগাছি, বকুলতলা, শালিমার অঞ্চলের মানুষেরা কয়েক সেকেন্ড বেঁচে থেকে দেখল—হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তাপ, তারপর উজ্জ্বল একটা আগুনের তরঙ্গ সমস্ত বাড়ি-ঘর-মানুষের ওপর এসে আঘাত করল। কোনোরকমে কয়েকজন চাপা পড়ে বেঁচে থাকলেও, এই 33 বর্গমাইল দ্বিতীয় ধ্বংসের বৃত্তে প্রায় প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটলো।

ইতিমধ্যে, গঙ্গার জলের ওপর দিয়ে প্রতি ঘন্টায় 160 মাইল বেগে উঠল ঝড়। উত্তাপ ছাড়াও, সমগ্র গঙ্গা পাগলের মতো আছড়ে পড়ল তীরবর্তী অঞ্চলে। ইতিমধ্যে বৃহত্তম কলকাতার (হাওড়া সমেত) মধ্যে আরও কিছু মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ওই আগুনের গোলাটি।

এই সময়, আটমাইল উঁচু পর্যন্ত গজিয়ে উঠল বিস্ফোরণের ধোঁয়া। সমস্ত আলো নিভে থাকলেও উজ্জ্বল হয়ে থাকল জ্বলন্ত বাড়িগুলো। দক্ষিণের গড়িয়া, উত্তরে বরানগর আগুনে ভরে গেল। লোকসংখ্যার পাঁচভাগ বিস্ফোরণের ধাক্কায় আর কুড়িভাগ উত্তাপে মারা গেল।

কার্জন পার্ক থেকে প্রায় ন-মাইল দক্ষিণে সোনারপুর বা উত্তরে পানিহাটি আর হাওড়ার শাঁকরাইলে দেখা গেলো, তিনভাগের একভাগ মানুষ মারাত্মকভাবে আহত আর দশভাগের একভাগ মৃত। বেশ কিছু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ইতিমধ্যে কেটে গেছে মাত্র কয়েক মিনিট। হয়তো রাত আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট তখন। এই 150 বর্গমাইলের ধ্বংসস্তূপের দিকে, আরো মফস্বলের লোকেরা ছুটে আসছে। সোনারপুরের এবং খড়দহের কিছু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে প্রায় অর্ধলক্ষ আহত মানুষের দেহ টেনে আনা হচ্ছে। উজ্জ্বল আগুনের আলোতেই সব ছোটাছুটি করছে।

লোকের মুখে গুজব, কারণ *আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান* বা অন্যসব দৈনিকের অফিসের শুধু ছাইটুকু পড়ে আছে। যদি বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় ধাক্কায় সবটুকুই নষ্ট না হয়ে থাকে—এই ভেবে মগরাতে বেতার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হলো। কারণ আকাশবাণী ভবনের ছাইটুকুও পাওয়া গেল না, আর সমগ্র দমদম্ বিমানবন্দরে দেখা গেলো শুধু আগুন। বিশৃঙ্খল মানুষকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার জীবিত জনা-পাঁচেক সভ্য জানিয়ে দিলো যে, মৃতের সংখ্যা পৌর অঞ্চলের হিসাব অনুযায়ী—

কলকাতা	বরানগর	দমদম্	গার্ডেনরীচ	হাওড়া	অন্যান্য
31 লক্ষ	76 হাজার	2 লক্ষ	1.50 লক্ষ	5 লক্ষ	10 লক্ষ

মোট 50 লক্ষ 26 হাজার

বৃহত্তর কলকাতার অর্থাৎ বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া, কল্যাণী থেকে ক্যানিং-এই সমগ্র অঞ্চলের 75 লক্ষ মানুষের মধ্যে, তিন ভাগের দু'ভাগ মৃত বলে জানা গেল। এরপরে যারা বেঁচে রইল, তাদের দেহের ওপর বোমাটির তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাব দেখা যেতে লাগল প্রতিবছর, কয়েক দশক ধরে। এটা গল্প নয়.....

আমেরিকার কংগ্রেশনাল অফিস অফ্ টেক্‌নোলজি অ্যাসেসমেন্ট, ডেট্রয়েট শহরের ওপর এক মেগাটন বোমার ধ্বংসের তাৎক্ষণিক ফলাফল কতখানি হতে পারে তা হিসাব করেছে। এখানে সেই হিসাবগুলোই উপযুক্তভাবে কলকাতার কার্জন পার্কের সম্ভাব্য ফলাফলের মতো করে লেখা হলো। আর, রাজনীতিক ও সামরিক, উভয় দিক থেকেই-কার্জন পার্কের আকাশে এক মেগাটন বোমা বিস্ফোরণ হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়।

1998 সালে, কলকাতার লোকসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে — আর তাই এ হিসাব আজকে করলে, মৃত আর ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা দাঁড়াবে আরো ভয়ঙ্কর।

নির্দেশিকা

1. Robert Jungk : *Brighter than a Thousand Suns* (Penguin, Middlesex, 1960)
2. H. J. Muller : *Studies in Genetics* (Oxford & IBH, New Delhi, 1974).
3. The committee for the compilation of Materials on Damage caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki : *Hiroshima and Nagasaki* (Basic Books, New York, 1981).
4. Arnold Kramish : *The Peaceful Atom in Foreign Policy* (Dell, New York, 1965).
5. *Time* (Chicago), 29 March 1982.
6. *Seientific World* (London), Vol, XXII, No 1, 1978.
7. Bertrand Russell : *Has Man a Future ?*, (Penguin Middlesex, 1916).

অতীতের কথা

অতীতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এ-সবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন — রায় দিয়েছেন মানুষের সুস্থ ভবিষ্যতের সপক্ষে। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ কিংবা পারমাণবিক শক্তির সপক্ষে রায় না-দেওয়া সেই ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন অনেক ধরণের কর্মক্ষেত্রের মানুষ। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক কে নেই সেই তালিকায় — যাঁরা পারমাণবিক ভয়াবহতার বিরুদ্ধে আমাদের বারবার সাবধান করেছেন। সেই অতীতকে ফিরে দেখার তাগিদ আমাদের অনুভূত হয়েছে, বোধহীন বিবেকহীন সেইসব 'পুরুষসিংহ' বিজ্ঞানী, আমলা, নেতাদের নৃশংস কাজকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে।

বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি

দু'বারের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী (প্রথমবার রসায়ন শাস্ত্রে, দ্বিতীয় বার শান্তির জন্য) লাইনাস পাউলিং Indian Council for Cultural Relations-এর আমন্ত্রণে মৌলানা আজাদ স্মারক বক্তৃতা দিতে 1967 সালে ভারতে এসেছিলেন। Science and World Peace নামের বইটি থেকে তাঁর বক্তৃতার দুটি প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে তুলে দেওয়া হলো। অনুবাদ : শ্রী মানস কুমার জোয়ারদার।

"নিউক্লিয়ার অস্ত্রের সম্ভাব্য বিস্তারের বিষয়ে আলোচনার জন্য আমার স্ত্রী ও আমি ভৌত বিজ্ঞানী, জীব বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের নিয়ে 1961-তে একটা আলোচনাসভা ডেকেছিলাম অসলোতে। এ সভায় যে ষাট জন মানুষ (পনেরোটি দেশ থেকে) অংশ নিয়েছিলেন তারা একটি বিবৃতি তৈরি করেছিলেন। নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের প্রসার গোটা বিশ্বের পক্ষে কেন চরম বিপজ্জনক সে বিষয়ে নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখানো হয়েছিল সে বিবৃতিতে :

1. নিউক্লিয়ার অস্ত্রধর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটি করে নতুন দেশের নাম যোগ হওয়া মানেই তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকেও একইরকম অস্ত্র সংগ্রহে প্ররোচিত করা।
2. নিউক্লিয়ার অস্ত্র যত বেশি হাতে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের ভুল ত্রুটি কিংবা যান্ত্রিক দুর্ঘটনার হাত ধরে বড় রকমের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার সম্ভবনা তত বেড়ে যায়।
3. ইচ্ছাকৃত নিউক্লিয়ার যুদ্ধ সম্ভাবনা বাড়ে যদি বেশি দেশের মধ্যে এ অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে।
4. পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশের সংখ্যা বাড়লে নিরস্ত্রীকরণে সাফল্য অর্জন আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়ে।
5. নিউক্লিয়ার অস্ত্রে বলীয়ান হবার পর কোনো দেশ নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সময় আরো বেশি করে আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়।

প্রতিটি অতিরিক্ত দেশ যখন নিউক্লিয়ার সমারাস্ত্র সংগ্রহ করে তা অন্যের কাছ থেকে নিয়েই হোক অথবা নিজেদের উদ্ভাবন থেকেই

হোক, তখন সেই সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এ সব ছাড়া আরো অনেক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া। নিউক্লিয়ার অস্ত্র নির্মাণে যে গোপন বিজ্ঞান-গবেষণার দরকার হয় তা বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ক্ষুণ্ণ হয়। মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যাহত হয়। সর্বধ্বংসী এ মারণাস্ত্র প্রতিরক্ষা, শিল্পসংস্থা এবং প্রশাসক গোষ্ঠীর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সে প্রভাব প্রায়শই রাজনৈতিক নীতি নির্ধারক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া নিউক্লিয়ার অস্ত্রগুলির নিক্ষেপণ ব্যবস্থা এমনই যে তাদের ব্যবহারের ওপর পূর্ণ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

যে সব যুক্তি এ বিষয়ে কাজ করে চলেছে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। এটা আমি ভারতীয় সংবাদপত্রে পড়েছি। বলা হয়েছে—পাকিস্তান যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের সম্ভার নিয়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তাহলে ভারতের ঐ অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তুলতেই হয়। এ যুক্তিও দেখানো হয়েছে, চীন যেহেতু পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ভারতকেও তাই আত্মরক্ষার জন্য নিউক্লিয়ার অস্ত্র বানাতে হবে।

নৈতিকতা ও শান্তির একজন প্রবক্তা হিসেবে আমি হতাশা ব্যক্ত না করে পারি না যখন দেখি ভারত 1962 সালে প্রতিরক্ষার ব্যয় তার জাতীয় আয়ের শতকরা 2.1 ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা 4.7 ভাগ করেছে। আমি আশা রাখি ভারত নৈতিকতা এবং সুস্থ চিন্তায় সারা বিশ্বকে অচিরেই আবার নেতৃত্ব দিতে পারবে। যুদ্ধবাজিতে ভারতের সে নেতৃত্ব দানের কোনো সম্ভাবনা নেই।

ভারত নিউক্লিয়ার অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তুলুক — এই অভিমতের বিরোধিতা আমাকে করতেই হবে। আমি পড়েছি— ভারত এখন ট্রম্বেতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরির উপযোগী প্লুটোনিয়াম তৈরি করছে। এবং হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা জানিয়েছেন, বারোমাসের মধ্যে ভারত একটি পারমাণবিক বোমাও তৈরি করতে পারে। আমি ভাবতেও পারি না ভারতের পক্ষে এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতার কাজ আর কিছু হয় কিনা। বিশ্বের সব চাইতে ধনী দেশ আমেরিকাও জনগণের স্বাস্থ্য ও নাগরিক কল্যাণকে বিসর্জন দিয়ে ব্যাপক সমরায়োজনের দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার জন্য বর্তমানে খরচ হচ্ছে বছরে 7500 কোটি ডালার (শুধু ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্যই বছরে 3000 কোটি ডলার)। বছরে 7500 কোটি ডলার অর্থাৎ 56,000 কোটি টাকা যা কিনা গোটা ভারতের বার্ষিক জাতীয় আয়ের দ্বিগুণ, নষ্ট করা হচ্ছে যুদ্ধের কাজে।

আমি আশা করব ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনসাধারণ General Elctro Research Institute-এর এম রামমূর্তি ও এমন আরো সব লোকদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করবে। শ্রী রামমূর্তি লিখেছিলেন, 'কেন ভারতের নিউক্লিয়ার অস্ত্র ভাণ্ডার থাকবে না? বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশের শিথিল ভাবমূর্তিতে এর মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আসবে। ক্ষমতার অবয়বে আসবে পূর্ণাঙ্গতা। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার করেছিলেন, ভারত কখনও নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরি করবে না — কেবল এ কারণেই পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশকে পেছনের আসনে চলে যেতে দেওয়া যায় না।' পারমাণবিক বোমা কিংবা যুদ্ধায়োজনের পেছনে অর্থ অপচয় না করেও ভারত শ্রীরামমূর্তির অভিধা মতো তার 'শিথিল ভাবমূর্তিকে' উজ্জ্বল করতে পারে।" *

* * *

"বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনের ফলে গত শতাব্দীতে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আমাদের খাবার-দাবার, আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও অস্ত্র ব্যবস্থা — সবেতেই এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ে আমাদের ধারণাও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ পরিবর্তন, এ ধ্যান-ধারণার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে কষ্ট হচ্ছে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের। আমার বিশ্বাস — আমরা এখন বাধ্য হয়ে পড়েছি সারা পৃথিবীর কাছে গ্রহণযোগ্য নৈতিক মূল্যবোধের কিছু বিধি প্রণয়নের সম্ভাব্যতা ঘিরে আমাদের নিজেদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে। পৃথিবীতে বহু যুক্তিবাদী আছেন, নিরীশ্বরবাদী আছেন, আছেন বহু খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং অন্য ধর্মানুসারী লোক। এ সব ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অপসারিতা আমার সামনে যে প্রশ্ন তুলে ধরে তা হলো : সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন কোনো মৌলিক নীতিগত বিধান আছে কি? আমার বিশ্বাস — আছে। যুক্তিসিদ্ধভাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত কায়দায় তা উদ্ভাবন করা যায় ঃ আমার সঙ্গে আমার নিজের সম্পর্ক কল্পিত, নিজের অভিরুচি সঞ্জাত (subjective), কিন্তু বাকি পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাস্তবানুগ (objective), তা সত্ত্বেও আমার চেতনার প্রমাণ থেকে আমি বিশ্বাস করি যে, আর পাঁচজনের মতো আমিও একজন মানুষ। আমি জানি, যদি ছুরি দিয়ে নিজেকে কাটি তো যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠব। আঘাত পাবার একটা কল্পিত অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করে। আমি দেখতে পাই, অন্য কেউ যদি নিজেকে ছুরি দিয়ে কাটে তো সেও যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে। এটা থেকে এবং এ রকম আরো সব পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কেটে গেলে আর সবাই আমার মতই যন্ত্রণা অনুভব করে।

কিসে আমি কষ্ট পাই তা আমর জানা। আর আমি এটা আশা করি যে আর সবাই এমন কাজ করুক যাতে আমার যন্ত্রণা যতটা সম্ভব কম হয়। সঙ্গত কারণে তাই আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, আমার কর্তব্যও অতএব সে রকম কাজ করা যাতে অন্য সকলের সব থেকে কম কষ্ট হয়। এই যুক্তি ধরে আমি একটি সূত্রে পৌঁছতে চাই যাকে বলা যায় সোনালি সূত্র (Golden Rule)। লিউক একে যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তা হলো — 'তুমি অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর তাদের সকলের সঙ্গে ঠিক সে রকম ব্যবহারই করবে। এ বিধিরই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে সব রকম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি — কাজ করার সময় এই নীতিই মেনে চলা হোক যেন মানুষের দুঃখকষ্ট ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা যায়। আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে, সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ নীতিই হোক মূল ভিত্তি। বড় ধরণের নিউক্লিয়ার যুদ্ধে সামিল হওয়া না হওয়া নিয়ে আলোচনার আসরে মানুষের দুঃখ দুর্দশা লঘুতমকরণ-নীতির প্রয়োগ শুরু করা যায়।' ❑

---

* এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন তিনি তাঁর পরের দিনের বক্তৃতায়। স্থানাভাবে সেই আলোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

বিজ্ঞানের বিভীষিকা

রাজশেখর বসু

সেই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি যখন ইওরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবীরা পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন তখন এখানেও তার অনুরণন দেখা গেছে শ্রী রাজশেখর বসুর মত চিন্তাশীল লেখকের কলমে। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে দেখিয়েছেন মানবস্বভাবের বর্তমান পর্যায়ে কেন নিউক্লিয়ার গবেষণা অকল্যাণই ডেকে আনবে। তাঁর সেই প্রবন্ধের প্রথম অংশটি হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

অনেক বৎসর আগেকার ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রুকুটি করে ঠোঁট কামড়ে হাতে ইট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ এগারো, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এখন পরস্পর ভয় দেখাচ্ছে। হয়তো একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিণাম কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়েরা দূর থেকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দুজনেই আমার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, সুতরাং এদের নিরস্ত্র করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।

মার্কিন আর সোভিএট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় ওই রকম, কিন্তু ওদের মামা নেই। এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণু-বোমা উদ্যত করে পরস্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি ত্রস্ত হয়ে আছে। রফার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবীব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি। এঁদের যুক্তি এই রকম।

পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশযানের সংখ্যা কম ছিল সেজন্য বোমা-বর্ষণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। 1870 খ্রীস্টাব্দের

ফ্রান্স-প্রুসিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোঅর আর রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। মেশিন-গান, দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সাবমেরীন, বোমা-বর্ষী বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের নাশিকা-শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য উৎকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্মনুষ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উদ্ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক জড়বুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের মতন আত্মসমর্পণ করবে। মোট কথা, মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃপ্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর হাতে যেমন জ্বলন্ত মশাল, অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক—বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের মূল। চন্দ্রলোক যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, রেশমের চাইতে মজবুত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য আমরা দশ-বিশ বৎসর সবুর করতে রাজী আছি। মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হক।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন— সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মানুষের সংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টিইয়ার্স ওঅর, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্টদের ধর্মযুদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুজেড ও জেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে লোকক্ষয় হ'ত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমায়ু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা ঘোর মূর্খতা।

উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝা দরকার— বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানবস্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিদ্যা বোঝায়। দুই বিদ্যাই পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির উপায়

নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃত পক্ষে শিল্পসাধনা। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে— মহাবিশ্ব মহাকাশে মহাকাল-মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে। যারা বিস্ময় বোধ করে না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে বেশী। যাঁরা বিস্ময়ের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। আর, বিস্ময়ের মূলে যে রহস্য আছে তার সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক দল জ্ঞানলাভেই তৃপ্ত হন, এঁরা নিষ্কাম শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর একদল নিজেদের বা পরের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এঁরা সকাম ফলিত বিজ্ঞানী। সংখ্যায় এঁরাই বেশী।

জ্যোতিষের অধিকাংশ তত্ত্বই নিষ্কাম বিদ্যা। হেলির ধূমকেতু প্রায় ছেয়াত্তর বৎসর অন্তর দেখা দেয়, মঙ্গলগ্রহরে দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ ফেঁপে উঠছে— এই সব জেনে আমাদের আনন্দ হতে পারে কিন্তু অন্য লাভের সম্ভাবনা নেই, অন্তত আপাতত নেই। সেগুন আর ঘেঁটু একই বর্গের গাছ, চামচিকার দেহে রাডারের মতন যন্ত্র আছে, তারই সাহায্যে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে— ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনও কোনও সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে লাগানো যায় নি। চুম্বক লোহা টানে, তার এক প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রান্ত দক্ষিণে আকৃষ্ট হয়— এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জ্ঞানমাত্র বা কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্তু পরে মানুষের কাজে লেগেছে। তপ্ত বা সিদ্ধ করলে মাংস সুস্বাদু হয়—এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে।

ভাল মন্দ নানা রকম অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষ চিরকাল অন্ধভাবে বা সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে আসছে। মোটামুটি কার্যসিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়, কিন্তু জনকতক কুতূহলী আছেন যাঁরা কার্য আর কারণের সম্বন্ধ ভাল করে জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী। আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে আগুনের উপর জল বসালে ক্রমশ গরম হতে থাকে, তারপর ফোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন—আঁচ যতই বাড়ানো হক, ফুটতে আরম্ভ করলে জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। আমাদের দেশের অনেক পাচক পাচিকা এই তত্ত্ব জানে না, জানলে ইন্ধনের খরচ হয়তো একটু কমত।

কাণ্ডজ্ঞান (common sense) , সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান—এই তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। স্থূল সূক্ষ্ম সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমান ইত্যাদির দ্বারা লব্ধ, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাবধানে অর্জিত, বহু প্রমাণিত, এবং তাতে কার্যকারণতা যথাসম্ভব নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হয়। চিরাগত ভিত্তিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমনকি খেলার নিয়মও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরঞ্জবিজ্ঞানও শোনা যায়।

যাঁরা নিষ্কাম জিজ্ঞাসু, লাভালাভের চিন্তা যাঁদের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধবিজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন যাঁরা ফলকামী, বিজ্ঞানের

সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ফ্যারাডে, কুরী-দম্পতি ও কন্যা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অন্য লোক কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এঞ্জিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, সালভার্সান স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধের, এবং বন্দুক কামান টরপিডো আর অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের উদ্ভাবকগণ ফললাভের জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এঁদের কাজে বিজ্ঞান মুখ্যত কার্যসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন মকদ্দমা জেতবার উপায়। নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার এবং তত্ত্বের প্রয়োগ—এই দুই বিদ্যাই বিজ্ঞান, কিন্তু বিদ্যার যদি অপপ্রয়োগ হয় তবেই তা ভয়ংকরী।

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করতে বলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর গুণ্ডার জন্য ছোরা তৈরী হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরী স্থগিত থাকুক।

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রয়োগ করেছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক—এই আবদার করা বৃথা। হবুচন্দ্রের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্র এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুদ্ধবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট মারণাস্ত্রের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশায় পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণু-বোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। আরও নানারকম নৃশংস যুদ্ধাস্ত্র আছে—টি-এন-টি আর ফসফরস বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো ইত্যাদি। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখনও মানুষ ধনুর্বাণ তলোয়ার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবেই দোষ।

অরণ্যবাসকালে শস্ত্রপাণি রামকে সীতা বলেছিলেন— কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ— শস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম মারণাস্ত্র যদি হাতে থাকে তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংযম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনমত যদি প্রবল হয় তবে অতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয় নি, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্য দুই পক্ষই সংযত হয়েছিল। পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধেও যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবসমাজের ধিক্কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়াকেও সংযত হতে হবে। আশার কথা, যাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শান্তিকামীরা ঘোষণা করছেন যে পরমাণু-

বোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রজা হত্যার চাইতে মহাপাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও যদি পরমাণু-বোমার বারবার বিস্ফোরণ হয় তবে তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মানবসন্তানের দেহে প্রকট হবে।

ক্রীতদাসপ্রথা এক কালে বহু প্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপদ্ধতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের সমবেত চেষ্টায় বহু পরিমাণে নিবারিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমাণুশক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে। এচ. জি. ওয়েলস্, ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্রা বসুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো যুদ্ধও নিবারিত হবে।

ডি. এ. ই. চেয়ারম্যান বলেন, প্রধানমন্ত্রী শোনেন

নব্বই সাল থেকে প্রথা চালু হয়েছে যে, যিনি-ই এদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন দু-একদিনের মধ্যেই তার কানের কাছে শুনিয়ে আসা হবে এদেশের নিউক্লিয়ার কর্মকাণ্ডের বিজয়গাথা। কীর্তন শুনে বিভোর হবেন যখন তিনি, তখন তার হাতে তুলে দেওয়া হবে বোমা বানানোয় 'হ্যাঁ'-'না' করার নির্দেশনামা। নরসিমা রাও থেকে শুরু করে এই সেদিনের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়িজীকেও শোনানো হয়েছিল সেই 'গাথা'। এবারে কীর্তনীয়া ছিলেন ড. চিদাম্বরম এবং ড. কালাম সাহেব। সেই গোপন আসর বসেছিলে গত 19 মার্চ সন্ধ্যায়। কীর্তন এবার সার্থক হয়েছে। বিভোর প্রধানমন্ত্রী কালবিলম্ব না করেই হুকুম দিয়েছেন 'লাগাও টেস্ট'। এখবর যাতে ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পারে তার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও শুরুতে টের পান নি কিছু। যদিও বিজেপি'র দলের ওপরতলায় ছড়িয়ে পড়েছিল এ খবর।

সূত্র : *Business India*, May 18 1998

নিউক্লিয়ার যুদ্ধ : প্রকৃত বিপদ

ডি. ডি. কোসম্বী

জে. ডি. বারনাল, জে. বি. এস. হ্যালডেন বা জোলিও ক্যুরির মতো পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা মতাদর্শ ও মানবিকতার যে পথে হেঁটেছেন, ভারতবর্ষের গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বীও সেই পথেরই সহযাত্রী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ যারা সমাজ ও ইতিহাসের সামগ্রিক প্রবাহের পরিণতি বলে মনে করেন, বিচ্ছিন্ন বিশেষজ্ঞতার ফসল নয়, কোসম্বী তাদের একজন। টাটা ইনস্টিট্যুট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের গণিত বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেবার পরেও তাই কোসম্বীর অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় ছিল, সংখ্যাতত্ত্ব, সুপ্রজননবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষার মতো স্পর্শকাতর ও বিতর্কমূলক বিষয়টি তাঁর গভীর মনন নিয়ে চিন্তা করছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি Science, Society and Peace নামক প্রবন্ধ সংগ্রহের অন্যতম। যে বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোসম্বী এ চিন্তা ভাবনা করেছিলেন তা আজ অনেকাংশেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বদলেছে। তবু পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষার গভীর বিপন্নতাকে যুগপৎ বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিতে দেখার যে মূলস্রোত চলে আসছে, তার সপক্ষে একটি ঐতিহাসিক দলিল, যার প্রাসঙ্গিকতা আজও অটুট।

ভাষান্তর : সত্যবান রায়

সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ আর নিত্যনতুন সমরাস্ত্রের বিরামহীন প্রস্তুতি ও পরীক্ষাপর্ব আজ আক্ষরিক অর্থেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনের জ্বলন্ত সমস্যা। আমরা প্রত্যেকেই জেনে গেছি এযাবৎ যে পরিমাণ পরমাণু অস্ত্রসম্ভার জমে উঠেছে তার প্রয়োগ শুধু মানুষ নয়, এই উপগ্রহে জীবনের শেষতম চিহ্নটিকেও মুছে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। এই মারণাস্ত্র প্রস্তুতির বার্ষিক ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব যদিও অতি সযত্নে রাষ্ট্রীয় বাজেটের অন্যান্য খাতের আড়ালে নিশ্চিদ্র গোপনীয়তায় রাখা হয়ে থাকে, তবু দুটি সত্য জলের মতো পরিষ্কার। এক, এখন বিশ্বে পরমাণু অস্ত্র প্রস্তুতির বার্ষিক ব্যয় 1939 সনের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে যত প্রথাগত অস্ত্র তৈরি হয়েছে তার সামগ্রিক ব্যয়কে ছাপিয়ে গেছে। দুই, এই বিপুল অর্থ যদি উন্নয়নশীল জাতি সমুহের হিতার্থে ব্যয় হতো, তবে এক সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের মুখ দেখতে পেত মনুষ্য প্রজাতি। দশ সহস্র মাইল দূর থেকে কারোর বেখেয়ালে ভুল বোতাম টিপে দেওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শংকা থেকে মুক্ত থাকতে পারত ক্ষমতার দৌড়ে অপ্রতিযোগী দেশের মানুষ। নতুন কলকারখানা, খনি আর যন্ত্রপাতি, নতুন হাসপাতাল আর বিদ্যালয় মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই আনত স্বচ্ছলতার ছোঁয়া। ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর দেশগুলো যদি বাকি বিশ্বের পিছিয়ে থাকা অংশের জন্য এই ব্যয় করতে সম্মত না হয়, কেউ তাদের

বাধ্য করতে পারবে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়াতেও এমন বহু মানুষ আছেন যাদের জীবনধারণে স্বচ্ছলতা সেরকম নেই। যদি অস্ত্র প্রতিযোগিতার ছবিটা বদলে গিয়ে তার জায়গায় আসত উন্নততর জীবনধারণের প্রতিযোগিতা যাতে এই পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র চতুষ্টয়ের হাতেই কেন্দ্রীভূত থাকত সমস্ত হাসপাতাল বা বিদ্যালয়, তবে কিছু বলার ছিল না। নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান টেনশনের চেয়ে সেও তবু ভাল ছিল। 1939-এর আগে বিশ্বের বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়করা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা প্রকাশ করে গেছেন। সে যুদ্ধ এসেছিল এই ভবিষ্যত দ্রষ্টাদের তাবৎ প্রয়াস সত্ত্বেও। তবু দুপক্ষ আবার এখন কেন কঠিন প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন সেই লক্ষ্যে, যার চেয়ে অশুভ আর কিছু হয় না? প্রশ্ন, কি সেই অশুভ? — অথবা বিপদের আশংকা কি সত্যিই অতিরঞ্জিত?

ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশদে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, তাতে মূল বিষয় হারিয়ে যেতে পারে প্রযুক্তি পরিভাষার ধোঁয়াশায়। নিউট্রন, ইলেকট্রন, মিউ মেসন, পাই মেসন, আলফা রশ্মি, গামা রশ্মি, ক্রিটিকাল মাস, প্লুটোনিয়াম, আইসোটোপ এতদ্বিষয়ে অনেক কিছুই পাওয়া যাবে বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকায়। বুলেট, বোমা, গোলা, বিষগ্যাস এইসব প্রথামাফিক মারণাস্ত্রের চেয়ে পরমাণু অস্ত্র অনেক অনেক বেশি ভয়ংকর। প্রথাগত বোমায় মৃত্যুর সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছিল জাপানের চীন-আক্রমণের সময়। আত্মরক্ষায় মরীয়া হয়ে জনৈক বিমানচালক বোমা ফেলে সাতশো আসামরিক মানুষকে হত্যা করেছিল। এরা সবাই সাংহাইয়ের রাস্তায় ভিড় জমিয়ে কুকুরের লড়াই দেখতে এসেছিলেন। হিরোশিমার বোমায় হতের সংখ্যা ছিল এর সহস্রগুণ। একটা পঞ্চাশ মেগাটন ক্ষমতার বোমা পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী ও তার চারপাশের লাগোয়া মফস্বল অঞ্চলকে মুছে দিতে পারে—আশি লক্ষ থেকে দেড় কোটি মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটিয়ে। সেই সাথে রয়েছে নিউক্লিয়ার 'ফল-আউট'-এর প্রশ্ন। 1954 সনে যে ক্ষমতার বোমা তৈরি হয়েছিল তা যদি আমাদের দিল্লীর ওপর ফেলা হতো তবে শুধু সাধের রাজধানীই বিলুপ্ত হতো না, দিল্লী থেকে কলকাতা অবধি দেড়'শ মাইল চওড়া পথের মধ্যে সমস্ত জীবিত প্রাণী নিহত হতো ; বিনষ্ট হয়ে যেত তাবৎ বৃক্ষরাজি।

এই পরিস্থিতিতে কেন যে জেনেভা সম্মিলন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীরা সম্মিলনের ভেতরে ও বাইরে এসব প্রসঙ্গ বহুবার উচ্চারণ করেছেন। তবু শান্তি চুক্তি সুদূর মরীচিকাই থেকে যাচ্ছে। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের স্বপক্ষে, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের বিপক্ষে এবং পরীক্ষা পাল্টা-পরীক্ষার পক্ষে প্রভূত যুক্তিতর্ক শোনা যাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমে। নিউক্লীয় পন্থীদের যুক্তিগুলো সংক্ষেপে এরকম : এক, তাপ পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার যুদ্ধের প্রকৃত প্রতিষেধক। দুই, এই ভয়ংকর মারণাস্ত্রের জন্য দায়ী বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীরা। তাদের তাড়নায় রাষ্ট্র বাধ্য হয় বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে। পরমাণু অস্ত্রের গবেষণা বিজ্ঞানচর্চাকে উন্নত করে শেষপর্যন্ত মানব জাতির বিকাশে সহায়ক হবে। তিন, পরমাণু অস্ত্রের বিপদকে অতিরঞ্জিত করে

দেখানো হয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তেমন কিছু নয়। কারণ বিকিরণের কিছু সদর্থক দিক আছে।

এবারে এই নিউক্লীয়পন্থী যুক্তিজালের বিশ্লেষণে আসা যাক। এর প্রথমটির চরিত্র স্পষ্টত রাজনৈতিক। বাকিগুলো সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা সঞ্জাত মতামতের ব্যাপার।

১. চরম প্রতিষেধক

প্রতিষেধক অসুখের সম্ভাবনাকে নির্মূল করে। অর্থাৎ রুশরা যদি প্রথম আক্রমণ করে, তবে প্রতিআক্রমণে তাদেরও নিশ্চিহ্ন হতে হবে। প্রতিআক্রমণকে যথেষ্ট কার্যকরি হতে গেলে নতুন অস্ত্র ও নতুন উৎক্ষেপণ পদ্ধতির ব্যাপারে নিখুঁত ও এলেমদার হতে হবে। সেজন্য চাই যথেষ্ট পরীক্ষা। বলা হচ্ছে রুশরা যে এখনো আক্রমণ করে নি সেটাই পাল্টা প্রস্তুতির কার্যকারিতার সাক্ষাৎ প্রমাণ। এই যুক্তি অনেকটা চৌপটির, সমুদ্রতটে স্নান করে সূর্যকে গ্রহণ-মুক্ত করার মতো। গ্রহণের দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ স্নান করে, সূর্যও গ্রহণের পরে আবার দৃশ্যমান হয়—এতে কি প্রমাণ হয়ে যায় যে, গ্রহণের দিন গণস্নান ব্যাপারটি গ্রহণমুক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশে তবে কিভাবে গণস্নান ছাড়াই গ্রহণের পর সূর্য আবার দেখা দেয়? তাহলে শুধু ভারতবাসীকেই পশ্চাদ্‌গামী কুসংস্কারাচ্ছন্নের অপবাদ সইতে হবে কেন? রুশরা কিছুতেই অন্য দেশকে তাদের অস্ত্রভাণ্ডার পরিদর্শন করতে দিতে সম্মত নয়। যদিও প্রতিপক্ষের ভূখণ্ডে তাদের পরিদর্শনের অনুমতি আছে। শুনতে অদ্ভুত লাগে বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে তা নয়। একজন যদি অন্যের উৎক্ষেপণ কেন্দ্রকে প্রথম সুযোগেই বিধ্বস্ত করে দিতে পারে, তবে কোনোরকম প্রতি আক্রমণের বিপদ ছাড়াই দ্বিতীয় দেশটির নগরীর ওপরে নির্বিঘ্নে বোমাবর্ষণ করা যাবে। এজন্য শুধু দু-ধরণের যোগ্যতা প্রয়োজন। প্রথমত, আক্রমণকারী দেশের অস্ত্রসম্ভারের পরিমাণ আক্রান্ত দেশের উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ধ্বংস করার পরেও তার প্রধান নগর ও লক্ষ্যস্থলগুলোকে বোমা-বিধ্বস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট হতে হবে। দ্বিতীয়ত, শত্রুর উৎক্ষেপণ কেন্দ্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকতে হবে, কারণ তা সর্বদা জনবহুল জায়গা থেকে দূরে গুপ্ত ঘাঁটিতে থাকে। এখন যদি এক দেশের গোপন ঘাঁটিতে অন্য দেশের পরিদর্শনের অনুমতি থাকে এবং দ্বিতীয় দেশটির পরমাণু অস্ত্রসম্ভার তুলনায় যথেষ্ট বেশি শক্তিশালী হয়, তবে তথাকথিত 'নিবৃত্তি যুদ্ধ' শুরু হয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক প্রবণতাকে নিবৃত্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। পরে বলে দিলেই হলো যে যুদ্ধটা ভুলবশত শুরু হয়ে গেছে। কেউ বেখেয়ালে ভুল করে হঠাৎ বোতাম টিপে দিয়েছে। অতএব পরিদর্শনের সম্মতি যদি না থাকে তবে প্রতিষেধক (deterrent) আসলে দুর্বলতর পক্ষেরই অস্ত্র। যতক্ষণ তার উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের হদিশ প্রকাশ হয়ে পড়ে নি, ততক্ষণই এই প্রতিষেধক কাজ করবে।.....নিউক্লিয় যুদ্ধের একমাত্র সমাধান যাবতীয় পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা, সমস্ত উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের বিনাশ, অস্ত্রসম্ভারের নিরাপদ রূপান্তর এবং সারা পৃথিবীতে বদ্ধ প্যাকেজে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে নজরদারি রাখা।

2. বিজ্ঞান

মারণাস্ত্র নির্মাণের নাটের গুরু হিসাবে বিজ্ঞানীদের প্রায়শই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। কোনো বিজ্ঞানীরই পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য সহস্রকোটি ডলারের সঞ্চয় নেই। বিজ্ঞানীদের যারা ডলার (অথবা পাউন্ড, ফ্রাঁ, রুব্‌ল) সরবরাহ করে, তারা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তা করে। বিজ্ঞানী যদি সেই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক না হয় তবে তিনি নিশ্চিতই তার চাকরিটি খোয়াবেন। এবং সম্ভবত সেই সাথে তার স্বাধীনতা অর্থাৎ বেণীর সঙ্গে মাথাটিও। পরমাণুশক্তির উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত অর্থ মুখ্যত লাগে প্রযুক্তিগত প্রয়োজনে ও কাঁচামাল কিনতে। এর সাথে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি আকস্মিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরও কোনো সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান এগিয়েছে শুধু অবিরাম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ধ্যান ধারণার বিনিময়ের মাধ্যমে। প্রথম প্রাচ্য বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসা বিদ্যা, প্রথম যাত্রারম্ভের সুবিধা হারিয়েছে আবিষ্কার-লব্ধ ফল গোপন রাখার জন্য। ইওরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের মূলে আছে গবেষণার ফলাফলের যথাযথ প্রকাশনা। একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীর অস্মিতার উৎস তার নামে প্রকাশিত কোনো মৌলিক উদ্ভাবনার বিষয়। তাপ-পারমাণবিক গবেষণায় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনা সযত্নে গোপন রাখা হয় রাজনীতিক ও সমরবিদ্‌দের তত্ত্বাবধানে, যাদের বিজ্ঞান চেতনার বহর বিশ্ববিজ্ঞানের লাভ বা ক্ষতি কিসে তা' বোঝার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই কিছু সুযোগ সন্ধানী বা তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানীই পরমাণু অস্ত্র গবেষণার পেছনে তাদের সময় ও শক্তি ব্যয় করবে। বিজ্ঞানী দাবি করে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পরীক্ষামূলক তাপ-পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কিন্তু তাতেও আছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও 'ফল-আউট' যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। 'পরিচ্ছন্ন' বোমা বলে কিছু হয় না। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বার্থে পরিচ্ছন্ন বা নির্দোষ বোমা তৈরির জন্য তাপ-পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষার যুক্তি যারা দেখান ও বিশ্বাস করেন তারা মানসিকভাবে বিকৃত।

3. জিন-ঘটিত বিপর্যয়

এটাই গহনতম বিপদ, এমনকি যে প্রজন্ম জন্ম নেয়নি তারও অস্তিত্বের বিপন্নতার উৎস। এরকম আমরা প্রায়শই শুনে থাকি, কিন্তু সচরাচর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হয় না। সমস্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণই দেহকোষের কিছু না কিছু ক্ষতিসাধন করে। কিছু ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই ক্ষতিকর ক্ষমতাকেও হিতার্থে, যেমন ক্যানসার আক্রান্ত দেহকোষ ধ্বংস করার কাজে, ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন কেউ কি বলবেন যে অবিরত পারমাণবিক পরীক্ষা ও বিস্ফোরণ ক্যানসার নির্মূল করবে অন্য কোনো বৃহত্তর ক্ষতি না করে?

.....মানবদেহে পরমাণু বিকিরণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নিউক্লিয়ার বোমার ভুক্তভোগী দেশ জাপানের অত্যন্ত যোগ্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল সেভাবে প্রকাশিত হয়

নি, ইংরেজি ভাষায়তো নয়ই। নিউক্লিয়ার পরীক্ষার আগে ও পরে বায়ুমণ্ডলীয় বিকিরণের প্রাত্যহিক প্রতিক্রিয়ার এবং বৃষ্টিপাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি সমস্তই পরিমাপ করা হয় এবং নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। আশ্চর্য, বিকিরণের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভারতে প্রকাশিত জাপ-পর্যবেক্ষণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব ফলাফল সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, এমনকি জাপানি ছাড়া অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত সব তথ্যও। জিনঘটিত নিদারুণ বিপর্যয়ের পরিষ্কার ধারণা করা যায় হিরোশিমার 'তেজস্ক্রিয়' মহিলাদের গর্ভজাত সন্তানদের শারীর-প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণে, যদিও এই মায়েরা বোমাবর্ষণের সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন না। প্রকাশিত কয়েকটি আলোকচিত্রই এই দুঃস্বপ্নকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।

এতেও গভীরতর বিপন্নতার পুরো ছবিটা পাওয়া যায় না। হিরোশিমা-মায়েদের গর্ভে যে শিশুরা জন্ম নিয়েছে, তারা কেউই স্বাভাবিক নয়, কেউ মৃত-প্রসবিত, কেউ ক্ষণজন্মা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনঘটিত বিকৃতির প্রতিক্রিয়ায় পরিণাম মৃত্যু। বিপর্যয় আরো ভয়ানক হয় যখন ছোট ছোট জেনেটিক পরিবর্তন একসাথে জমা হয়ে (Recessive genes) বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয় জিন-বিকৃতি। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি স্বল্পায়ু পতঙ্গের (banana fly) ওপর বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। এদের আয়ুচক্র মাত্র এগারো দিন। এদের ডিম্বাণুকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে এনে কয়েকশত প্রজন্মের ওপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। 1954 সনে ইঁদুরের দেহে বিকিরণের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমেরিকায় মূল্যবান কাজকর্ম হয়েছে এবং তা প্রকাশিতও হয়েছে। মাছির থেকে বহুগুণ জটিল ইঁদুরের শারীর-প্রক্রিয়া ও জিনের ওপর বিকিরণের প্রভাব লক্ষ্য করা হলো। ইঁদুর থেকে মানুষ, আরও দীর্ঘ ব্যবধান। মানবদেহে বিকিরণের প্রভাব লক্ষ্য করা হলো। ইঁদুর থেকে মানুষ, আরও দীর্ঘ ব্যবধান। মানবদেহে বিকিরণের প্রভাবে কি তবে এইসব নিরীক্ষণ থেকে অনুমান করা যায়। ড্রসোফিলা এবং ইঁদুরের ক্ষেত্রে জিনঘটিত বংশানুক্রমিক বিকৃতির অভিমুখ জানা গেছে। জানা গেছে বিকিরণ কতটা দায়ী—জীবন-চক্রে ও জটিল দেহকোষ গঠনে; নিরীক্ষণের সামগ্রিক ফল অত্যন্ত ভয়ংকর। মানুষের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক জিন বিকৃতির ক্রমপুঞ্জিত প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে বিশ থেকে পঞ্চাশ প্রজন্ম কেটে যাবে, আর এই প্রলম্বিত সময়কালে এই বিকৃতির প্রভাব প্রায় পুরো মানব প্রজাতির মধ্যে বাহিত হয়ে যাবে নির্বিচারে, কে কম্যুনিস্ট কে অকম্যুনিস্ট কে ব্রাহ্মণ কে অব্রাহ্মণ তার বাছবিচার না রেখে। যেহেতু এই বিকৃতি কোনো শারীরিক অসুখ নয়, তাই এর কোনো নিরাময় নেই। শয়ে শয়ে কোটি মানুষ, অমৃতের পুত্র-পুত্রী, তাদের শরীরে বয়ে বেড়াবে ভয়ংকর জিন। তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের অন্তহীন পরীক্ষা তাই মানবপ্রজাতির সামগ্রিক ভবিষ্যতকে বাজি ধরে একটা বীভৎস জুয়া খেলা। এর কি কোনো প্রয়োজন আছে?

পারমাণবিক জাতীয়তাবাদ ও পারমাণবিক আইন

জাস্টিস ভি. আর. কৃষ্ণআয়ার

পরমাণু শক্তির নিরিখে মানুষের জন্য বিজ্ঞানের ভূমিকা সূর্যোদয়ের কিংবা সূর্যাস্তের। এই পৃথিবীর অস্তিত্ব এখন অনেকটাই নির্ভর করছে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের শুভবুদ্ধি, পরমাণু গবেষণার কাপ্তানদের দয়া এবং জনসাধারণের যৌথ সচেতনতার ওপর। যদি তাঁরা পারমাণবিক মানবতাবাদের পক্ষে দাঁড়ান। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিসম্বলিত একটি নতুন ও স্পষ্ট আইনী ব্যবস্থাও খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

যুদ্ধ কিংবা শান্তি, যে লক্ষ্যেই হোকনা কেন, পরমাণু বিভাজন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে আইনী নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে আর দেরি করা উচিত নয়, কারণ ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর গুরুতর, কুফল নিদারুণভাবে একমুখী;আগামীকাল হয়তো বড়ই দেরি হয়ে যাবে। এমনকি পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলিকে সত্যি সত্যি এমন ত্রুটিহীন হতে হবে যাতে কোনোদিন কোনোভাবেই সেগুলি তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে মানুষের মৃত্যুর কারণ না হয়ে পড়ে। দ্রুতহারে উন্নতির জন্য তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলির শক্তির জোগান অবশ্য প্রয়োজন, এবং এইসব দেশে বহুজাতিক কোম্পানিরাও শক্তি ফিরি করছে। কিন্তু কখনোই তা ঝুপড়ি কিংবা গ্রামে বাস করা মানুষদের জন্য নয়। তাই কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে, তৃতীয় বিশ্বের (যে কোনো দেশের) কাছে এটা মূল প্রশ্ন হতে পারে না। প্রশ্ন হলো কার জন্য বিদ্যুৎ এবং কতটা নিরাপদে তা পাওয়া যাবে। শক্তি

Committe for a Sane Nuclear Policy আয়োজিত অষ্টম জাতীয় সেমিনারে (23-24 মার্চ ,1985) বিচারপতি কৃষ্ণআয়ার প্রধান বক্তা হিসেবে যে বক্তব্য রাখেন, এখানে তার সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ প্রকাশ করা হল। পূর্ণাঙ্গ বয়ানটির জন্য ধীরেন্দ্র শর্মার 'The Indian Atom — Power & Proliferation' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। অনুবাদক র. ম.।

নীতির এই গণতান্ত্রিক উপাদান এবং শান্তিপূর্ণ (পরমাণু, কর্মসূচীকে সহজেই পারমাণবিক বোমা তৈরির কাজে লাগানোর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা—এই দুটিই যে কোনো দেশের জাতীয় পারমাণবিক কর্মসূচীর উৎসমূল।

ভারতের এক্ষুনি প্রয়োজন একটি সুস্থ জাতীয় পারমাণবিক নীতি, যাতে আমাদের অসংশোধনীয় ভ্রান্তি ও অবিবেচিত বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব বা অগ্রগতিকেই বন্ধক রেখে না বসে।.....

পারমাণবিক ভারতের সমস্যা

নিউক্লিয়ার টেকনোলজি প্রসঙ্গে ভারতে দুটো মৌলিক প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে আসে। প্রথমত পরমাণু বোমার অধিকারী হওয়া এবং দ্বিতীয়ত পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন।

আমাদের সংবিধান দেশশাসনের জন্য মৌলিক দিকনির্দেশ করেছে। 51ধারা নির্দেশ করে যে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তির সম্মান রক্ষা করে চলবে। 48A এবং 51A ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র ও নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য হলো 'পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতিবিধান' এবং 'জীবন্ত প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং মানবিক ও অনুসন্ধানী মনোভাব' গড়ে তোলা। এগুলি শুধু শব্দের সম্ভার নয়, অবশ্যপালনীয় নিয়ম। 38 ধারায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে পারমাণবিক ন্যায়বিচারের কথা উঠতেই পারে। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ দ্বারা জীবনহানি ঘটানো 21 নং ধারা অনুযায়ী গর্হিত। পরমাণু নীতির ক্ষেত্রে এই সমস্ত সাংবিধানিক নির্দেশাত্মক নীতি বিবেচ্য।

ইসলামাবাদের নিউক্লিয়ার অপকর্মের জবাবে ভারতকেও পরমাণু বোমা বানাতে হবে যাতে ভীতিপ্রদর্শন ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে, এধরণের মতবাদকে একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। পরমাণু অস্ত্র মানবজাতির পরম শত্রু, যদি কোথাও ব্যবহার করা হয় সর্বত্র ফিরে আসবে প্রস্তরযুগ। হিরোশিমার 40 বছর পরে যখন আন্তর্জাতিক-ভাবে পরমাণু অস্ত্রকে বিদায় জানানোর সংগ্রামে রত বহু মানুষ এবং জবাহরলাল নেহরু থেকে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত যখন ভারত ও তার বাইরে লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী মানুষের হয়ে আওয়াজ উঠিয়েছেন সার্বিক পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে, তখন অদূরদর্শী বাস্তববাদীরা এবং সন্ত্রস্ত জাতীয়তাবাদীরা দেশাত্মবোধের ধুয়ো তুলে পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলে দেখায়। যে পাকিস্তানিরা আমাদেরই জ্ঞাতিভাই এবং সাম্রাজ্যবাদী মহাশক্তির সামরিক ছায়ায় একনায়কের শাসনাধীন। অবিশ্বাসী ইসলামী বোমার প্রতিষেধক হিসেবে তারা ভারতীয় পরমাণু বোমার দাবি তোলে। এই ভয়ংকর অথচ মনে-ধরা-যুক্তির অসারতা কেবল তাঁরাই বোঝেন যাঁরা ভীতিপ্রদর্শনের নিউক্লিয় নীতির অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত।

যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, যদি পাকিস্তান বা চীনের পরমাণু বোমা থাকে, তবে আরও শক্তিধর হবার জন্য বা নিতান্তই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ভারতীয় অহমিকাও দিল্লীকে বোমা বানাতে বাধ্য করতেই পারে। বিধ্বংসী জাত্যাভিমান ছাড়াও অন্য

অনেক কারণ আছে যাতে বলা যায় কেন আমাদের দুই প্রতিবেশীরই নিউক্লিয়ার বোমার দেউলে রাজনীতির কবলে পড়া উচিত নয়। সরল যুক্তি হলো এটা আমাদের সাধ্যাতীত। চিরকাল আমরা এর বিরোধিতা করে এসেছি এতে আমাদের কোনোদিন কোনো লাভ হতে পারে না। বুদ্ধ-গান্ধীর ঐতিহ্যের কথা বলে, জোটনিরপেক্ষতার নেতৃত্ব দিয়ে এতদিন নিউক্লিয় অস্ত্র অকেজো করার কথা বলে এসেছি, আজ মিলিটারিকে নিউক্লিয়ার অস্ত্রসজ্জিত করাটা কি আমাদের নৈতিক স্খলনের দ্যোতক হবে না? নিউক্লিয় অস্ত্রে বৃহৎশক্তির একাধিপত্যে অস্ত্র প্রসারণ-রোধ চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী আবরণ, তাই না আমরা ঐ চুক্তিতে(NPT) স্বাক্ষর দিই নি ! এদিকে পার্শিং-2, ক্রুইজ মিসাইল, স্টার ওয়ার কারিগরি এবং অতিবৃহৎ মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাম্রাজ্য সজ্জিত হয়ে তৈরি আছে—এই গ্রহের প্রতিটি নারী-পুরুষ-শিশুর জন্য চার টন বিস্ফোরণের সমতুল 50,000 নিউক্লিয় অস্ত্র নিয়ে, অন্যদিকে বিনিদ্র, নিরন্ন, অর্ধনগ্ন জীবনের আশা আনন্দবিহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ—আজব বৈপরীত্যের এই বিশ্বজোড়া বাস্তবতার যদি কোনো যৌক্তিক বার্তা ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছায় তবে তা হবে ভীতি প্রদর্শনক্ষমতার ভারসাম্যের নীতির নির্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করা; ছুড়ে ফেলা এই যুক্তি যে, যুদ্ধই শান্তির দূত, মৃত্যুই জীবন, লক্ষ লক্ষ অভুক্তের কাছে আরও একটি বোমাই নিয়ে আসবে সম্মান ও নিরাপত্তার আশ্বাস!

তৃতীয় বিশ্বের দেউলিয়া অর্থনীতির দেশে পরমাণু বোমা হলো মুর্ছারোগীর রাজনীতি। যদি পাক একনায়কতন্ত্র বিপজ্জনক বোকামির আশ্রয় নেয়, ভারতীয় গণতন্ত্রও কি তার অনুকরণ করেই তাকে বাহবা দেবে?

..... পরমাণু বোমার মূল্য এবং একটুকরো রুটির উপযোগিতা জনগণকে জানানোই হবে সর্বোত্তম রাজনীতি। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানী চূড়ামণিরা, যাদের কারও কাছে জবাবদিহির দায় নেই, হয়তো রাজনীতির বিজ্ঞান সম্পর্কেও অনবহিত তাঁরা। পরমাণু বোমা তৈরি করা এবং হাতে রাখাও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে কাজ এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। আমেরিকা বা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এই আইনী দায় মানছে না—এটা ভারতের অজুহাত হতে পারে না। আমাদের সংবিধানও ভাষায় ও ভাবে নিউক্লিয় অপরাধের বিরোধী।

পরমাণু আইনের সংশোধন প্রয়োজন

নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগতভাবে কোথায় আমরা আছি দেখতে হবে। দেখতে হবে এব্যাপারে আমাদের আত্ম নির্ভরতা এবং বিশেষ করে মানব দেহে এর ক্ষতিকর প্রভাবের দিক থেকে। ভূপাল আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, সরকারি বিজ্ঞানীদের ওপর আমরা পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি না। থ্রি মাইল আইল্যান্ডের পারমাণবিক বিপর্যয়ে আমেরিকার কারিগরি বিশেষজ্ঞদের মুখোশ খসে গেছে এবং গোটা দুনিয়াকে জানিয়েছে বিপদ সংকেত।

..... দেশ আমাদের সবার। পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে বেশি কিছু নয়, শুধু, কোনোরকম ত্রুটি ঘটে গেলে, অনেক অনেক বেশি বিপজ্জনক।

এবং সেজন্যই সেগুলি কঠোর তদারকি দাবি করে। ভারতের সাধারণ কর্মী থেকে ম্যানেজার পর্যন্ত অনেক কিছুই ঠিকঠিক চলে না, এবং যা হবার নয় তাই হওয়া নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই সংবেদী কিন্তু নির্ভীক আইনের ভূমিকা রাখতেই হবে।

অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্ট, 1962-এর অধীনে রুলস বা নীতি তৈরি করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছে পরমাণু শক্তি দপ্তরের আইনের শাসন না মানার মানসিকতা। পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট কমিটির কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, 23 বছর ধরে কোনো রুলস তৈরিই হয় নি। বিজ্ঞানী বুরোক্র্যাটরা কি পার্লামেন্টের কমিটিকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে? আর পরমাণু শক্তি নিয়ে পার্লামেন্টে কোনো সদর্থক বিতর্কই বা কোথায়?

দ্য অ্যাটমিক অনার্জি অ্যাক্ট, 1962'র পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন; বিশেষ করে সংবিধানে 21ধারার প্ররিপ্রেক্ষিতে যাতে নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা আছে। এবং তা পরমাণু বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পদ্ধতিগতভাবে পরমাণু (শক্তি) সম্পর্কিত আমদের আইনটি নিতান্তই কাঁচা।

একটি বাসের পারমিট নিতে গেলে বা এমনকি কোনো স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা একটুকরো জমি পেতে চাইলেও বিধিবদ্ধভাবেই প্রকাশ্য তদারকি বাধ্যতামূলক। লক্ষগুণ বেশি ঝুঁকির একটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বেলায় তাহলে রাষ্ট্র কেন জনগণের অংশগ্রহণ সহ তদারকির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করবে?

দ্য অ্যাটমিক অনার্জি অ্যাক্ট, 1962 কোনো প্রকাশ্য শুনানির সংস্থান নেই, বরং উল্টে, তথ্য প্রকাশেও বাধা আরোপিত হয়েছে। গোপনতা ও সন্দেহই তার আধার। আইনটি সংবিধান বিরোধীই বলা যায়। 21 ধারায় প্রদত্ত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মৌলিক অধিকার এবং তৎসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা এই আইনে অস্বীকৃত। ... অবিসংবাদিত-ভাবে, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি জীবনের পক্ষে বিরাট বিপজ্জনক এবং শোভনতা, ন্যায়বিচার ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতেই এদের উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু আইনটি এদিক থেকে অতি সরল এবং আদালতে চ্যালেঞ্জ করলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। তাই এই আইনের পর্যালোচনা, সংশোধন এবং নবীকরণ এমনভাবেই করতে হবে, যাতে পরমাণু ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে মানবিক চিন্তার ছাপ থাকে আইনী প্রক্রিয়ায়।

সংবিধানের 48A এবং 51A ধারা অনুযায়ী পরিবেশ দূষণ ঘটানো গর্হিত কাজ। পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশ বিধ্বংসী সম্ভাবনাও আইনী তদারকির অন্তর্ভুক্তি দাবি করে। হয়তো নিরাপত্তার প্রকরণগুলি কার্যকর; কিন্তু তদারকিটা প্রয়োজন।

শেষ করার আগে বলি..... পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিরোধী নই আমি; তবে ভারতীয় পরিস্থিতির যদি-কিন্তু এবং কারিগরি সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে নয়।... যাই হোক, উন্নয়নের মূল্য চুকোতে তো হবেই। —চাই জনসাধারণের অংশগ্রহণ, গণসচেতনতা এবং প্রকাশ্য পর্যালোচনার দাবিতে আন্দোলন।..... সামাজিক ন্যায়বিচার আমাদের সংবিধানের মৌল ভিত্তি পারমাণবিক ন্যায়বিচারও তারই অঙ্গ। ❑

অস্ত্র-বিরোধী ঘোষণা

পঞ্চাশের দশকের অস্ত্র সম্বরণে দাবীতে গড়ে ওঠা নানান উদ্যোগের মধ্য দিয়েই পরবর্তী কালে জন্ম নিয়েছে বহু যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন। ইওরোপ-আমেরিকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই আন্দোলন। পরোক্ষে এই আন্দোলনের চাপই বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের বাধ্য করেছিল নানান চুক্তির উদ্যোগ নিতে। পঞ্চাশের দশকের সেই ঘোষণাপত্রগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই অসীম।

পাগওয়াশ আন্দোলনের পটভূমি

বার্ট্রান্ড রাসেল একটি খসড়া বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আইনস্টাইন সহ বিশ্বের বিশেষ খ্যাতির অধিকারী কিছু বিজ্ঞানীর কাছে। যেখান থেকেই 'পাগওয়াশ আন্দোলন'-এর সূত্রপাত। আইনস্টাইন তাতে সই করেছিলেন মৃত্যুর দু-দিন আগে। রাসেল ভেবেছিলেন তখনকার জীবিত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনের সই করা কোনো বিবৃতি সরকার এবং সাধারণ মানুষের ওপর সম্ভবত কিছু প্রভাব ফেলবে। শুরু করার পক্ষে তার মতে যথেষ্ট, এমন কিছু সই সংগ্রহ হয়ে যাবার পর তিনি সাংবাদিক সম্মিলনে বিবৃতিটি প্রকাশ করে দেন। 'Observer' কাগজের একজন কর্মীর উদ্যোগে এবং মূলত ঐ সংবাদপত্রেরই সহায়তায় সম্মিলনটি অনুষ্ঠিত হয় 1955 সালের 7 জুলাই। অধ্যাপক রটব্ল্যাট ছিলেন সভাপতি। প্রস্তাব করা হয়েছিল— বৈজ্ঞানিকদের এক সভা ডাকা হবে এবং সেখানে বর্তমান বয়ানটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো প্রস্তাবের ওপর তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে। সেই বয়ানটির অনুবাদ করে দিয়েছেন শ্রী মানস কুমার জোয়ারদার।

মানবতার ওপর আক্রমণের এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি সর্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের বিপদ বুঝিয়ে বলার জন্য বিজ্ঞানীদের এক বৈঠকে মিলিত হওয়া দরকার। দরকার সঙ্গে দেওয়া খসড়াটির ভাবানুসারী কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা।

বিশেষ কোনো দেশ, মহাদেশ বা কোনো মতবাদের সদস্য হয়ে কথা বলার জন্য আমরা এখানে আসি নি। এসেছি মানুষের তথা মানব প্রজাতির সদস্য হিসেবে যার ধারাবাহিক অস্তিত্বই এখন সন্দেহের সম্মুখীন। সংঘর্ষসঙ্কুল এই পৃথিবীর ছোটখাটো সমস্ত বিরোধ ছাপিয়ে সব থেকে বড় হয়ে উঠেছে এখন সাম্যবাদ এবং সাম্যবাদ-বিরোধী সংঘাত।

রাজনৈতিকভাবে সচেতন প্রায় প্রতিটি মানুষেরই এই সব এক বা একাধিক বিষয় সম্পর্কে জোরালো অভিমত থাকতে পারে। কিন্তু আমরা চাই— আপনারা যদি পারেন এই সব অনুভূতি সরিয়ে রেখে নিজেদেরকে জীবজগতের এক প্রজাতির সদস্যমাত্র ভাবুন। সেই প্রজাতি যার একটি বিশিষ্ট ইতিহাস আছে, পৃথিবী থেকে যার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া আমরা কেউ চাই না।

একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কাছেই সুখকর, অন্য সকলের কাছে নয়— এমন একটি শব্দও আমরা বলব না। সকলে আজ সমানভাবে সঙ্কটগ্রস্ত। আর এই সঙ্কট যদি সবাই বুঝতে পারে তবেই আশা থাকে যে, সম্মিলিতভাবে তা পরিহার করা যাবে।

আমাদের নতুন পথে ভাবার কথা শিখতে হবে। নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে শিখতে হবে। আমাদের পছন্দের দল কোন্ পদ্ধতিতে যুদ্ধ জিতবে, সে প্রশ্ন নয়। কারণ এখন আর তেমন কোনো পদ্ধতির অস্তিত্ব নেই। আমাদের প্রশ্ন করতে হবে—কোন্ পদ্ধতিতে সামরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যায়। যুদ্ধ সব দলের পক্ষেই অমঙ্গলকর হতে বাধ্য।

যুদ্ধে নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার হলে তার ফল কি হতে পারে সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এমন কি কর্তৃত্বের আসনে বসে থাকা অনেক মানুষেরই সঠিক ধারণা নেই। জনসাধারণ এখনও মনে করে, এতে শুধু শহরগুলিই ধ্বংস হয়ে যাবে। মনে করা হয়—নতুন বোমা পুরোনো বোমার চাইতে বেশি শক্তিশালী, আর, একটা অ্যাটম বোমা যেখানে হিরোশিমা উড়িয়ে দিয়েছিল, একটা হাইড্রোজেন বোমা বৃহত্তম শহরগুলি যেমন লন্ডন, নিউইয়র্ক বা মস্কো গুঁড়িয়ে দেবে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধে বিশাল বিশাল শহরগুলি গুঁড়িয়ে যাবে। ছোট ক্ষয়ক্ষতির এটা একটা অন্যতম নগণ্য ঘটনা। লন্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কোর সমস্ত জনপ্রাণী নিঃশেষ হয়ে গেলে তার আঘাত পৃথিবী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা এখন জেনেছি, বিশেষ করে বিকিনিতে পরীক্ষার পর, নিউক্লিয়ার বোমা আগের ধারণার চাইতে অনেক অনেক বেশি জায়গা জুড়ে তার ধ্বংসলীলা ক্রমাগত ছড়িয়ে চলে।

যে বোমা হিরোশিমাকে ধ্বংস করেছিল তার চাইতে আড়াই হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী বোমা এখন তৈরি করা যায়—এটা এখন প্রামাণিকভাবেই বলা হয়ে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি কিংবা জলের মধ্যে এ-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলে তা থেকে বাতাসে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে তা নীচে নামে এবং কালান্তক ধুলো আথবা বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। এই ধুলোকণাই জাপানের মৎস্যজীবীদের এবং তাদের ধরা মাছেদের আক্রান্ত করেছিল। প্রাণঘাতী এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে কেউ তা জানে না। তবে হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধে সমগ্র মনুষ্য জাতির নিঃশেষ হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ বিজ্ঞমহল একমত। গোটা কয়েক হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হলে আশঙ্কা থাকে এক সর্বজনীন মৃত্যুর। কিছু লোকের মৃত্যু ঘটবে সঙ্গে সঙ্গেই, বেশিরভাগই রোগব্যাধির যন্ত্রণায় ধীর গতিতে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে।

অনেক সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা, সমরবিদ্যা বিশারদেরা। জঘন্যতম পরিণতি সম্পর্কে কেউ অবশ্য নিঃসন্দেহ নন। তারা সম্ভাব্য ফলাফলের কথা বলেন, নিশ্চয় করে কেউ কিছু বলতে পারেন না। আমরা এ যাবৎ দেখতে পাই নি যে, এ প্রশ্নে বিশেষজ্ঞদের মতামত তাদের নিজস্ব রাজনীতি বা সংস্কারের ওপর কোনোরকম ভাবে নির্ভর করেছে। বরং আমাদের গবেষণায় এ পর্যন্ত এটাই দেখেছি যে, এটা নির্ভর করে কেবল বিশেজ্ঞটির ঐ বিষয়ে জ্ঞানের পরিধির ওপর। দেখেছি—বিষয়টি সম্পর্কে যারা সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল তারা সব থেকে বেশি বিষণ্ণ।

তাই আমরা কঠোর, মর্মান্তিক এবং অপরিহার্য এক সমস্যা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমরা কি মানব জাতিকে নিঃশেষ করব, নাকি মানুষ যুদ্ধকে বিদায় জানাবে? মানুষ এ বিকল্পের মুখোমুখি হবে না, কারণ যুদ্ধকে ত্যাগ করা খুব কঠিন।

যুদ্ধের বিলোপসাধন করতে গেলে চাই জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমিতকরণ যা কারো কাছেই রুচিকর নয়। কিন্তু বিষয়টি ঠিক ঠিক বোঝার পক্ষে সব চাইতে বেশি যা ঝামেলা করে—তাহলো, 'মনুষ্যজাতি' কথাটি সম্পর্কে অস্পষ্ট ও বিমূর্ত ধারণা। মানুষের কল্পনায় এটা কমই আসে যে, সঙ্কট শুধু আবছা ধারণা দিয়ে মোড়া 'মনুষ্যজাতি'র নয়। সংকট তাদের 'নিজেদের', নিজেদের ছেলেমেয়েদের নাতিনাতনিদের। তাদের এটা খুব কমই বোধগম্য হয় যে যন্ত্রণাবিদ্ধ করাল মৃত্যু সমাসন্ন—তাদের নিজেদের আর যাদের ভালবাসেন প্রত্যেকের। তাই তারা আশা রাখেন—আধুনিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করলে যুদ্ধ সম্ভবত চলতে দেওয়া যায়।

প্রপঞ্চময় এ আশা। হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার নিয়ে শান্তির সময় যতই চুক্তি হোক, যুদ্ধের সময় তার কোনো বাধ্যবাধকতাই মান্য হবে না। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষই লেগে যাবে হাইড্রোজেন বোমা তৈরির কাজে। কারণ, যদি একপক্ষ বোমা বানায় এবং অপরপক্ষ না বানায় তাহলে যে-পক্ষ বানিয়েছে সে নিশ্চিতভাবেই বিজয়ী হবে।

সাধারণ অস্ত্রহ্রাস কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে নিউক্লিয়ার অস্ত্রবর্জন চুক্তিতে চূড়ান্ত সমাধান না মিললেও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধিত হবে এতে। প্রথমত—পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে যে কোনো চুক্তির সুফল এটাই যে এতে উত্তেজনা প্রশমনের খানিকটা সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত—যদি থার্মো নিউক্লিয়ার অস্ত্রসস্ত্র পরিত্যক্ত হয় এবং যদি একপক্ষ চুক্তি পালন নিয়ে আরেকপক্ষের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে, তা হলে পার্ল হারবারের মতো অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা কমে যাবে। বর্তমানে দুপক্ষই এ ব্যাপারে সামরিক দুশ্চিন্তার শিকার। এ ধরণের চুক্তিকে তাই আমরা স্বাগত জানাব। যদিও এটা হবে নিতান্তই প্রাথমিক পদক্ষেপ।

বেশিরভাগ মানুষই অনুভূতির দিক দিয়ে নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যেকার বিষয়গুলি যদি যে কোনো উপায়ে নিষ্পত্তি করতে হয় যাতে কেউ কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হয়, সে কমিউনিস্ট হোক বা তার বিরোধী, এশীয়া হোক বা ইওরোপীয় অথবা আমেরিকাবাসী, সাদা হোক বা কালো—তাহলে মানুষ হিসেবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সেসব বিষয় কিছুতেই যুদ্ধ দিয়ে মীমাংসা করা যাবে না। আমরা চাই—পূর্ব এবং পশ্চিম উভয়েই বিষয়টি অনুধাবন করুক।

আমরা চাইলে শান্তি, জ্ঞান, বৈদগ্ধের অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি আমাদের সামনে। কলহ ভুলতে পারি না বলে এ সবের বিকল্প হিসেবে আমরা কি মৃত্যুকে বেছে নেব? আমরা মানুষ হিসেবে আবেদন রাখছি মানুষের কাছে—বাকি সব ভুলে গিয়ে শুধু মনুষ্যত্বের কথাই মাথায় রাখুন। তা যদি পারেন তো নতুন স্বর্গের রাস্তা আপনাদের সামনে খোলা। না পারলে, বিশ্বজনীন মৃত্যুর ঝুঁকি।

সিদ্ধান্ত

আমরা এই সভার কাছে এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের কাছে নীচের সিদ্ধান্তটির সঙ্গে সহমত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি :

'ভবিষ্যতের যে কোনো যুদ্ধে যেহেতু নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহৃত হবেই এবং এর ফলে যেহেতু মনুষ্যজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে, আমরা তাই বিশ্বের সমস্ত সরকারের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি—এটা বুঝতে এবং সকলের কাছে স্বীকার করতে যে তাদের কোন লক্ষ্যই বিশ্ব যুদ্ধ দিয়ে অর্জন করা যাবে না। নিজেদের মধ্যে বিরোধের সব বিষয় তাই শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটিয়ে ফেলার উপায় বার করার জন্য আমরা তাদের কাছে আবেদন করছি।'

স্বাক্ষর করেছেন

PROFESSOR MAX BORN (Professor of Theoretical Physics at Berlin, Frankfurt, and Gottingen; Professor of Natural Philosophy, Edinburgh. 1936-53 ; Nobel Prize in physics).

PROFESSOR P. W. BRIDGMAN (Professor, Harvard University; Nobel Prize in physics).

PROFESSOR ALBERT EINSTEIN..,

PROFESSOR L. INFELD (Professor, University of Warsaw; Member of Polish Academy of Sciences ; joint author with Einstein of *The Evolution of Physics* and of *The Problem of Motion*).

PROFESSOR J. F. JOLIOT-CURIE (Professor at the College de France; Member of the Institut and of the Academy of Medicine; President of the World Federation of Scientific Workers; Nobel Prize in chemistry).

PROFESSOR H. J. MULLER (Formerly a Professor in Moscow, India, etc.; now a Professor at University of Indiana; Noble prize in physiology and medicine).

PROFESSOR LINUS PAULING (Director of the Gates & Crellin Laboratories, California Institute of Technology; Noble Prize in chemistry).

PROFESSOR C.F. POWELL (Professor, Bristol University; Nobel prize in physics).

PROFESSOR J. ROTBLAT (Professor of Physics, University of London; Medical College of St Bartholomew's Hospital).

BERTRAND RUSSELL.

PROFESSOR HIDEKI YUKAWA (Professor, Kyoto University; Nobel prize in physics).

9235 জন বিজ্ঞানীর আবেদন

বিজ্ঞানী ড. লাইনাস পাউলিং ছিলেন পারমাণবিক বোমার বিপদ থেকে বিশ্বকে রক্ষার করার উদ্যোগে একজন অগ্রণী কর্মী। তিনি 1958 সালের জানুয়ারিতে 9235 জন বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র জমা দেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব মিস্টার হ্যামারজেল্ড-এর হাতে। সেই আবেদনপত্রটি ছিল এই রকম :

"আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী বিজ্ঞানীরা এই আবেদন জানাচ্ছি যে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধের জন্য এখুনি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি করা হোক।

প্রতিটি বোমার পরীক্ষা পৃথিবীব্যাপী তেজস্ক্রিয় পদার্থের বোঝা বাড়িয়েই চলেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে এবং এমনভাবে জার্ম-প্লাজম্-এর ক্ষতি করছে যে আগামীদিনে পৃথিবীর বুকে বিকৃত মানবশিশুর জন্মের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে।

যদ্দিন এই অস্ত্র পৃথিবীর তিনটি শক্তির হাতে সীমাবদ্ধ আছে তত দিন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি গড়ে ফেলা তবু সম্ভব। কিন্তু এই পরীক্ষা যদি চলতেই থাকে এবং এই অস্ত্র অন্যান্য রাষ্ট্রের হাতে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দায়িত্বজ্ঞানহীন কোনো রাষ্ট্রনেতার খামখেয়ালিতে পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দেবে।

এক্ষুনি পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধের একটি চুক্তি আগামীদিনে এই অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করতে পারে যা নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে এই বিশ্বকে।

মানুষের মঙ্গল কিসে হয় সে ব্যাপারে সকলেরই দায়িত্ব আছে। বিজ্ঞানী হিসেবে এই অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে আমরা বিশেষভাবে অবহিত, ফলে এই তথ্য অন্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা মনে করছি সকল ধরণের পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করার জন্য এক্ষুনি এ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।"

ভিয়েনা ঘোষণাপত্র 1958

এমন একটি সময়ে আমরা কিজ্‌বুয়েল ও ভিয়েনাতে সমবেত হয়েছি যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি পারমাণবিক অস্ত্র আজ মানুষ ও সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে সক্ষম; প্রতিদিনই সেই ধ্বংসের প্রকরণগুলোকে আরো ধারালো করে তোলা হচ্ছে। এখানে সমবেত বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকে পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের এধরণের পরিণতির কথা ভেবে শঙ্কিত ছিলেন এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, আজ সর্বাত্মক একটি পারমাণবিক যুদ্ধ পৃথিবীর পক্ষে হবে অভূতপূর্ব রকম চরম বিপর্যয়ের ব্যাপার।

আমাদের ধারণা পারমাণবিক অস্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা খুবই শক্ত। সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর অহেতুক জোর দিতে গেলে হয়তো সেটাই যুদ্ধ শুরু করার কারণ হয়ে উঠবে।

বিভিন্ন দেশ পারমাণবিক অস্ত্র সহ অন্যান্য মজুত বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র বাতিল করার জন্য রাজি হয়তো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কিভাবে সেগুলো বানাতে হয় সেই জ্ঞান তো কোনোভাবে বিনষ্ট করা যাবে না। এটা তাই চিরকালের জন্য মানবজাতির পক্ষে এক আতঙ্কের বিষয় হয়ে রইল। আগামীদিনের যে কোনো বড় ধরণের যুদ্ধের সময় যুযুধান দেশগুলো ফের পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে অথবা বাধ্যও হতে পারে তৈরি করতে, কারণ যুদ্ধের

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় পাগওয়াশ সম্মিলনে গৃহীত ঘোষণাপত্রের অংশ এটি। সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় 1958 সালের 20 শে সেপ্টেম্বর। এই ঘোষণাপত্রে উপস্থিত একজন মার্কিন বিজ্ঞানী সই করেন নি। ঘোষণাপত্রটির অনুবাদক শ্রী সুধেন্দু প্রসাদ বসু।

সময় কোনো দেশই নিশ্চিত হতে পারবে না যে, শত্রুপক্ষও ওই অস্ত্র তৈরি করছে না। এমন এক পরিস্থিতিতে আমাদের ধারণা শিল্পোন্নত দেশগুলি এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই এই অস্ত্র মজুত করা শুরু করতে পারবে। তার পর থেকে এই অস্ত্র ব্যবহারের পথে একমাত্র বাধা থাকবে শান্তির সময় করা এই অস্ত্র না ব্যবহার করার চুক্তি। যেহেতু পারমাণবিক অস্ত্র যুদ্ধের পরিণতি নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে সেজন্যই এই অস্ত্র ব্যবহারের প্রলোভন অপ্রতিরোধ্য, বিশেষকরে পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যে দেশের নেতা তার পক্ষে। এজন্যই মনে হয় আগামীদিনে কোনো বড়সড় যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হতেই পারে, সাথে ভয়াবহ পরিণতি যা যা হওয়ার হবে।

কখনও কখনও এমনটা বলা হয়ে থাকে যে, সীমিত উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে ছোটখাটো যুদ্ধ হতেই পারে এবং তাতে পৃথিবীর বড় কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু ইতিহাস বলে যে, ছোটখাটো যুদ্ধই বড় যুদ্ধে পরিণত হয় ; পারমাণবিক অস্ত্রের যুগে যা হতে দেওয়া যায় না। মানুষকে তাই উদ্যোগী হতে হবে যাতে সকল প্রকার যুদ্ধই এড়ানো যায়, এমন কি ছোটখাটো যুদ্ধও।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা হচ্ছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফল ; সেটাই আবার জন্ম দেয় অবিশ্বাসের। তাই যে কোনো পদক্ষেপ যা এই অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে প্রশমিত করবে, যৎসামান্য পরিমাণে হলেও যদি তা সমতার ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় নজরদারির ভিত্তিতে অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে এবং সৈন্যসংখ্যা তাতে কমে, তাহলে তা একান্তভাবে কাম্য আমাদের কাছে। সেই লক্ষ্যে সমস্ত প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাই, বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ সনাক্তকরণের সম্ভাব্যতা নিয়ে সম্প্রতি জেনেভাতে যে চুক্তি হয়েছে, তাকে স্বাগত জানাই। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার ফলেই যে সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া সম্ভব হয়েছে সেজন্য বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা বিশেষ ভাবে আনন্দিত। আমরা আনন্দের সাথে লক্ষ্য করছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ব্রিটেন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলিকে সরকারিভাবে অনুমোদন করেছেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য ; আমরা একান্তভাবে আশা করব এই সম্মতি দেওয়ার পর অচিরেই এমন এক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হবে যাতে সকল প্রকার পারমাণবিক পরীক্ষা ক্রমে ক্রমে বন্ধ হবে এবং এর ওপর এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণ গড়ে উঠবে। এটাই হবে আন্তর্জাতিক স্তরে টানাপোড়েন কমানো এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ।

যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে আমরা যে সমস্ত সম্ভাবনার কথা বলেছি, সম্মিলনে পরিবেশিত রিপোর্ট ও বক্তব্যে তারই সমর্থন মিলেছে। এই সমস্ত তথ্য-প্রমাণ এটাই ইঙ্গিত করছে যে আগামীদিনের কোনো যুদ্ধে যত পারমাণবিক অস্ত্র এই পর্যন্ত তৈরি হয়েছে তার একটি বড় অংশ যদি যুদ্ধরত দেশগুলির শহর এলাকায় তাক করে ছোঁড়া

হয় তাহলে সেইসব দেশের সভ্যতার কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ মারা যাবে। এমনটাই ঘটবে তা সেই ব্যবহৃত বোমা বিস্ফোরণ ফিউশন রিঅ্যাকশন (তথাকথিত পরিচ্ছন্ন বোমা) দিয়েই হোক কিংবা ফিশন রিঅ্যাকশন (বা তথাকথিত অপরিচ্ছন্ন বোমা) দিয়েই হোক। জনবসতি এবং শিল্প কারখানা ধ্বংস করা ছাড়াও দেশের সরবরাহ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করার মাধ্যমে আক্রান্ত দেশের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করবে এই বোমা।

প্রধান কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক অপরিচ্ছন্ন ফিশন বোমা মজুত করেছে এবং মনে হচ্ছে তারা এমনটা করেই চলেছে। পুরোপুরি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বিশেষ ক্ষেত্রে (এই অপরিচ্ছন্ন বোমার) এমন কিছু সুবিধে আছে, যা বড় যুদ্ধের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারকে অনিবার্য করে তুলতে পারে।

এই অপরিচ্ছন্ন বোমার যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ভস্ম ছড়িয়ে পড়বে তাতে আক্রান্ত দেশের বিরাট এলাকার মানুষের মৃত্যু ঘটাবে। বিপুল সংখ্যায় এই বিস্ফোরণের ফলে (যার প্রতিটি বিস্ফোরণ লক্ষ লক্ষ টন সাধারণ রাসায়নিক বিস্ফোরকের শক্তির সমান) যে তেজস্ক্রিয় ভস্ম ছড়িয়ে পড়বে তা কেবল যে দেশের ওপর বোমা ফেলা হয়েছে তার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না, বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের ভূপৃষ্ঠে। এর ফলে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আরও বহু লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটবে আক্রান্ত দেশ ছাড়াও অন্যান্য এলাকায়।

এছাড়া আরও অনেক দীর্ঘস্থায়ী বিকিরণজনিত ক্ষতি হবে মানুষের এবং অন্যান্য প্রণীজগতের। যেমন লিউকেমিয়া, হাড়ের ক্যানসার, ইত্যাদির মতো শারীরিক অসুস্থতা থেকে শুরু করে জিন সংক্রান্ত ক্ষতি হবে যা বংশানুক্রমে প্রবাহিত হবে পরবর্তী প্রজন্মে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ক্ষয়ক্ষতি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের চাইতে অনেক বেশি হবে। তাই মানবজাতির পক্ষে আশু কর্তব্য হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে যুদ্ধকেই এড়ানো যায়।

আমাদের বিশ্বাস বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা এবং সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে বিজ্ঞানী হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ঐতিহ্যগতভাবে বিজ্ঞান একটি আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড। বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকলেও, বা তাদের মধ্যে দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সহজেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য একটি সাধারণ ভিত্তি খুঁজে পেতে পারে ; কারণ তারা ব্যবহার করে একই ভাবধারা, একই পদ্ধতি ; তারা কাজ করে একই বৌদ্ধিক লক্ষ্যে। মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব তাই যৌথ বোঝাপড়ার গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীদের এই একে অপরকে বোঝার ক্ষমতা এবং এক সাথে কাজ করার মানসিকতা তাই চমৎকারভাবে কাজে লাগতে পারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সেতু রচনায় এবং

তাদেরকে একই কাজের লক্ষ্যে মিলিত করায়। আমরা মনে করি, যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করবে। নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করতেও সাহায্য করবে, যা দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ মেটানোর জন্য খুবই প্রয়োজন এবং যা প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে আবশ্যক পটভূমিও বটে। আমরা আশা করব বিজ্ঞানীরা মানব সমাজ এবং তাঁদের দেশের প্রতি দায়িত্বের কথা মনে রেখে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে তাদের ভাবনা, সময় ও শক্তি নিয়োজিত করবেন।

এটা আমাদের বিশ্বাস যে, বিজ্ঞান সব থেকে ভালভাবে মানবজাতির কল্যাণসাধন করতে পারবে যদি তা বাইরের চাপিয়ে দেওয়া কোনো গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকে এবং যদি সে সমস্ত রকম অনুমান ও ধ্যান-ধারণা এমন কি বিজ্ঞানের ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে বর্তমানে যে অবিশ্বাস কাজ করছে সেটাই জন্ম দিয়েছে পরস্পরের মধ্যে সামরিক প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতার এবং তাতে সামিল করা হয়েছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে। অনেক দেশে মানুষের কাছে বিজ্ঞান যেন সমরাস্ত্র উদ্ভাবনের জন্যই নিযুক্ত, এমন এক ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা তাই হয় কখনো প্রশংসিত হন জাতীয় সুরক্ষায় তাদের অবদানের জন্য, নয় তো নিন্দিত হন ধ্বংসাত্মক অস্ত্র উদ্ভাবন করে মানবজাতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য। অনেক দেশেই আজ বিজ্ঞানচর্চার জন্য ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক আনুকূল্য পাওয়ার পেছনে আছে দেশের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য লাভের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য মেলে বলে। এজন্যই বিজ্ঞান আজ মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার এবং মানুষের কল্যাণে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত।

যে পরিস্থিতি এই অবস্থার জন্ম দিয়েছে তাকে আমরা ধিক্কার জানাই এবং সমস্ত জনসাধারণ ও তাদের সরকারের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাই যে স্থায়ী শান্তির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য তারা উদ্যোগী হোন।

Signed by one scientist from Australia, Austria, Bulgaria, Denamrk, the German, Democratic Republic, Hungry, the Netherlands, Norway, Poland, Yugoslavia, respectively ; by two from Canda, Czechoslovakia, and Italy ; three from India ; four from France ; five from the Federal Republic of Germany, and Japan ; seven from Great Britian ; ten from USSR ; and twenty from USA. ❑

আদালতে আর্জি

গত এগারোই এবং তেরোই মে ভারত সরকারের আচমকা পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোয় নতুনভাবে এই দেশের মানুষের পক্ষে যে বিপদ ডেকে আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আঠেরোই মে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে কয়েকটি নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়। এই আবেদনে আমাদের সাথে স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন হিউম্যান জাস্টিস ইন ইন্ডিয়া, ন্যাশানাল অ্যালায়েন্স ফর পিপলস্ মুভমেন্ট এবং নাগরিক মঞ্চ। আবেদনের প্রতিলিপি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং স্থানীয় বন্ধু সংগঠনগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। এছড়াও রাজ্যের বাইরে এবং বিদেশেও পরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং সংগঠনের কাছে পাঠানো হয়েছিল ই-মেইলের মাধ্যমে। পত্রপত্রিকাগুলিতে এই সংবাদ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথেই প্রকাশিত হয়েছে। আর বাইরের বহু ব্যক্তি ও সংগঠন এই আবেদনে স্বাক্ষরকারী হতে আগ্রহ প্রকাশ করে 'মেইল' করেছেন আমাদের। এখন অপেক্ষায় আছি, যদি আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় এই আবেদন। এর হুবহু প্রতিলিপি প্রকাশ করা হলো। ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং সংগঠন আবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অথবা আলাদাভাবে লিখতে পারেন প্রধান বিচারপতির কাছে। যথেষ্ট সংখ্যক আবেদন সেখানে জমা পড়লে এর গুরুত্বকে বাড়াতে সাহায্য করবে আশা করা যায়। এই মর্মে কোনো প্রশ্ন থাকলে চিঠির শেষে দেওয়া ঠিকানা, টেলিফোন অথবা 'ই-মেইল' মাধ্যমে যোগাযোগ করা যেতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে প্রেরিত আবেদনপত্র

To
The Honourable Chief Justice of India
Supreme Court
New Delihi 110001

In the matter of :

Protection of the Indian People's Fundamental Right to Life and Personal Liberty against the Physical, Environmental, Social, Psychological, Moral and Economic Consequences of the Recent Test Explosions of Five Nuclear Devices by the Government of India on 11 May 1998 and 13 May1998 at Pokhran, Rajasthan, and against the Threats of such Test in Future; and against the Suppression of Facts in Relation to the said Test Explosions of Nuclear Devices and its Future.

Honourable Sir,

We, the undersigned organizations and individuals from various walks of life seriously concerned about the environment, society, health, education and rights of the Indian people for some decades, humbly pray to you to protect the Indian People's Fundamental Right to Life and Personal Liberty against the consequences of the recent test explosions of five nuclear devices by the Government of India on 11 May 1998 and 13 May 1998 at Pokhran, Rajasthan.

We humbley bring the following facts in this regard to your Lordship's kind notice :

1. The diabolical, destructive and devastating environmental, physical, biological, social, psychological and economic consequences of the nuclear explosions and its preparation are now well-known to the concerned people of the world in all scientific details.

2. The said consequences, both short lerm and long term, not only affect the concerned adults of the present generation, but also the absolutely unconcerned population and the children of the present and future generations for thousands of years.

3. Any test nuclear explosions is no exception in its effects, and its preparation of that test uses the known dangerous chain of processes, from the manufacturing of the necessary radioactive materials to the disposal of the radioactive wastes, which is already established as the threats to the human and natural environments.

4. The consequences of the preparation and test of nuclear devices are not known to the majority of the people of India, and the consequences of the present test explosions are never disclosed to them by the Government of India.

5. Even all the time, the Government of India is trying to suppress the data and factual information regarding the preparation and test of the present nuclear devices.

6. Thus the acts of the Government of India regarding the present nuclear test explosions go to cause threats and damage to the life and liberty of the Indian people, who are mostly ignorant of the short term and long term effects of these nuclear test explosions and its preparation.

7. Only some immediate material loss, physical reaction and mental shocks of the people residing very near to the present site of test nuclear explosions, are reported in the newspapers (xerox copies of selected reports are annexed hereto and marked 'A')

8. In 1956, to oppose all kinds of nuclear explosions, including test explosions, the Government of India published a great book '*NUCLEAR EXPLOSIONS AND THEIR EFFECTS*' (Publication Division, Government of India, 1956, revised edition 1958), prepared by the scientists of the Defence Science Organization, with the foreword by the then Honourable Prime Minister Jawaharlal Nehru. This book presented most important physical and biological consequences of low and high yield nuclear explosions in details, and the book became famous in the peace-loving world and was translated into several languages in different countries.

9. In 1956, the then Honourable Prime Minister Jawaharlal Nehru expressed the principle of the Government of India, against all nuclear explosions including test explosions, in the Foreword of the above book by the following words :

'But even without war we have what are called nuclear test explosions which, in some measure, spread this evil thing over large parts of the world. These explosions continue in spite of the dangers inherent in them.

I trust that this study, brief and incomplete as it is, will be of some use in directing people's minds to the dreadful prospect of war in the nuclear age and to the dangers of continuing nuclear test explosions.

10. Any change of Politics and Prime Ministers of the Government of India could not change the inherent danger of the nuclear explosions including test explosions, and the present Government of India acted in a manner absolutely against its own principle of peace and healthy environment, and against the Indian people's fundamental right to life and personal liberty guaranteed by the Constitution of India, by never directing people's minds to the dangers of continuing nuclear test explosions.

11. After the publication of the above book in 1956-58 by the Government of India, more and more facts about the dangers and hazards of nuclear test explosions, particularly underground test explosions, have been reported in various scientific studies.

12. For instance, an underground test explosion was carried out by the United States of America on 10 December 1961 with the detonation of a 5 Kiloton nuclear device 1216 feet underground at a test site 25 miles southeast of Carlsbad, New Mexico, exploded in an 8-by-10 feet chamber cut into a strata of rock salt, produced pressure greater than expected, and it rocked the surrounding desert floor and caused clouds of intensely radioactive steam to escape from the mouth of a vertical shaft connected with the detonation chamber by 1000 feet tunnel, where radioactivity reached 10,000 roentgens an hour (where as maximum safe exposure being half roentgen yearly) at the shaft's mouth, and the Atomic Energy Commission of US closed nearby highways and took other local precautions (reported in, for example, Grace M. Ferrara (Ed): *Atomic Energy and the Safety Controversy*, Facts on File, New York, 1978, at page 147).

13. In both the cases of nuclear test explosions in 1974 and 1998, the Government of India neither gave prior information to the people nor published any detailed and necessary report about the nuclear test explosions, which happened to be urgent to assess the risks and dangers in these explosions, and never disclosed the fate of the people affected thereby.

14. The Government of India cannot legally suppress the necessary information and data about the preparation and consequences of the nuclear test explosions in 1974 and 1998, in the name of 'security' of India.

15. Where the life and personal liberty of the people are in danger, then the right to life and personal liberty of the people could be better protected by the disclosure of the information and data about the preparation and consequences of the nuclear test explosions in 1974 and 1998, and the disclosure of security strategy of the Government of India in relation to the same.

16. In the case of *'New York Times Company vs. United States'*

[403 US 713 (1971)], about the publication of the secret Pentagon Papers in relation to the Vietnam war in the newspapers, the Honourable Supreme Court of US observed :

> 'The word 'security' is a broad, vague generality whose contours should not be invoked to abrogate the fundamental law embodied in the First Amendment. The guarding of military and diplomatic secrets at the expense of informed representative government provides no real security for our Republic.'

Thus their Lordships allowed the disclosure of the secret papers of the US Government in relation to the Vietnam war.

17. Though on 6 November 1971, the special session of the Honourable Supreme Court of US voted (4-3) against a last minute brief filed by the Committee for Nuclear Responsibility and seven other environmental, anti-war and American Indian groups asking for a postponement of the most powerful underground nuclear test on the Alaskan Island, by the order of the Court of Appeals for the District of Columbia, the Atomic Energy Commission (US) released 187 pages of secret documents, including the secret memorandum questioning the safety of the underground test. [vide, Grace M. Ferrara, (Ed): op. cit. pages 153-4]

18. Prior to the test nuclear explosion both in 1974 and 1998, the residents near the site of the underground test explosions were never informed of the actual happenings and its consequences, including the immediate earthquake following the explosions, and thus the neighbourhood people were deprived of their right to life and personal liberty illegally and unconstitutionally, and deceived by the Government of India.

19. In the same way, the entire people of India were deprived of their right to life and personal liberty and deceived by the Government of India, as the entire people were not informed of the actual happenings and its consequences of the test nuclear explosions beforehand.

20. The Government of India acted above the Constitution and Constitutional Rights of the people, which should be subjected to the judicial review.

21. The decision of the Government of India to make nuclear bombs depriving the people of their Constitutional Rights should be subjected to the judicial review, particularly the entire chain of processes to make a nuclear bomb from the mining of the radioactive materials to the disposal of radioactive waste.

22. Any special act or, ordinance giving power to the Government of India to act against the Fundamental Rights of the people is ultra vires.

23. The Government of India is liable to compensate the damage caused to the local people of Pokhran and others, by the test nuclear exlosions of 1974 and 1998.

24. The Government of India is to conduct a comprehensive survey on the consequences of the test nuclear explosions, of 1974 and 1998.

25. The Government of India is to disclose the strategy secrets which allegedly compelled it to make nuclear bombs and its test explosions.

26. As one of the most important decisions in the history of humanitarian law, environmental law and human rights law, to outlaw the threats or use of nuclear weapons, the International Court of Justice on 8 July 1996, observed [in Para 87]:

> "87. Finally, the Court points to the Martens Clause, whose continuing existence and applicability is not to be doubted, as an affirmation that the principles and rules of humanitarian law apply to nuclear weapons."

27. All these above facts are brought to your Lordship's kind notice with our strong faith in the observation of this Honourable Supreme Court regarding the people's right to life and persinal liberty, that :

> "The compulsion of constitutional humanism and the assumption of full faith in life and liberty cannot be so futile or fragmentary that any transient legislative majority in tantrums against any minority, by the three quick readings of a bill with requisite quorum, can prescribe any unreasonable modality and thereby sterilize the grandiloquent mandate..... In India, because of poverty and illiteracy, the people are unable to protect and defend their rights, observance of fundamental rights is not regarded as good politics and their transgression as a bad politics". [*Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 2 S.C.R.62*]

In the circumstances, we humbly pray to your Lordship that this Honourable Supreme Court may kindly pass any order or orders :

a) To stay any further test nuclear explosion by the government of India;

b) To stay all official propaganda by the Government of India, in support of the test nuclear explosions and nuclear devices or bombs;

c) To compel the Government of India to disclose all the facts regarding the test nuclear explosions;

d) To compel the Government of India to compensate the damage already caused to the people residing near the site of the test nuclear explosions of 1974 and 1998;

e) To investigate the consequences of the preparation and test explosions of the nuclear bombs;

f) To review the entire chain of processes of manufacturing nuclear devices, from Uranium mining to the disposal of the radioactive wastes;

g) To review the Government actions in relation to the test nuclear explosions;

h) To review the discretionary powers of the Government of India regarding nuclear bombs & its test explosions ;

i) To declare any Act or Acts or Ordinance, by which the Government of India supposed to be empowered to act contrary to the Constitutional Rights of the Indian people, as ultra vires.

j) To stop production of all nuclear arms by the Government of India.

We, further pray to your Lordship to hear us and give us a chance to clarify our above submissions in details.

With regards,
your faithfully,
Saumen Guha 18 MAY 1998

For SCIENTIFIC WORKERS' FORUM, WEST BENGAL,
(Reg. No. S/ 22142/1978-79), C/o Dr. Abhijit Lahiri, 252 Lake Town, Block A, Calcutta 700089.

Prof. R. N. Majumdar Department of Chemical Technology, University of calcutta, 92 Acharya Prafulla chandra Road, Calcutta 700009.

R. N. Chakraborty, Department of Applied Physics, University of Calcutta, 92 A.P.C. Road, Calcutta 700009

Latika Guha, HUMAN JUSTICE IN INDIA, L/D-5 Kusthia Housing, Calcutta 700091

Subhas Ganguly, B 22/8 Karunamoyee Housing, Salt Lake City, Calcutta 700039.

Sukhendu Bhattacharya, National Alliance of People's Movement, 18 Surya sen street, Calcutta 700073.

Naba Dutta, Nagarik Mancha, 134 Raja Rajendralal Mitra Road, Room-7 Block B, Calcutta 700085.

The news clipping from the dailies appended with the appeal.

1. 'Cracked houses, leaking tanks, why us?' *The Telegraph*, 14.5.98.
2. Underground 'black magic' brings back ghost of, '74', *The Telegraph*, 15.5.98.
3. 'Villagers complain of nosebleed', *The Sunday Statesman*, 17.5. 98.

এই আবেদনের কোনো অংশ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা বা প্রশ্ন থাকলে অথবা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে কিছু জানার থাকলে এই ঠিকানা /টেলিফোন/ ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।

সৌমেন গুহ,

LD-5 কুষ্ঠিয়া হাউসিং, কলকাতা 700039

টেলিফোন 343 83 74.

E mail : Sm1 @ cucc. ernet. in অথবা swfwb @ hotmail. com.

❑❑❑

আপনিও আবেদন করুন

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আপনিও আবেদন করতে পারেন। আপনি আপনার পছন্দমতো করে লিখে পাঠাতে পারেন। আর যদি আমরা যে বয়ানে লিখেছি সেটা আপনার কাছে উপযুক্ত মনে হয় তাহলে হুবহু সেই বয়ানেও লিখতে পারেন। নিজে এককভাবে লিখতে পারেন অথবা বন্ধুদের সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করে পাঠাতে পারেন। এখানে একটি সরলভাবে লেখা চিঠির বয়ানও ছেপে দেওয়া হলো। চাইলে এই বয়ানেও লিখতে পারেন। আসলে ভারত সরকারের এই ভয়ঙ্কর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা নাগরিকরা যেমন একদিকে মিছিল সমাবেশ করে আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছি, তেমনি এটিও একটি পদক্ষেপ বলে ভাবতে পারেন। অনেকেই আছেন মিটিং মিছিলে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না, তাদের কাছে এটাও একটা উপায় নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করার। আপনি উদ্যোগ নিন, আপনার পরিচিত জনদেরও অনুরূপ উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করুন।

To
The Honourable Chief Justice of India
Supreme Court
New Delhi 110001

In the Matter of:
Protection of Indian Peoples's Right to Life and Personal Liberty against the Government of India's recent Nuclear Test Explosions at Pokhran and possible such Tests in future. & against the Suppression of all Facts in relation to the Nuclear Weapons and Explosions.

Honourable Sir,

We the undersigned Citizens of India from various walks of life, pray to you for the protection of our right to life and personal liberty against the Government of India's Nuclear Weapons & their Test Explosions.

Now we know most of the facts of destruction caused by the nuclear weapons to the man, biological world, environment, property and society. Also, the process of marking any nuclear weapon is extremely dangerous for the present and the coming generations.

In this circumstance, we pray to you to:

1. Pass an order to stop Government of India's Test Neclear Explosions;
2. Pass an order to compel the Government of India to compensate the damage caused to the people by the test nuclear explosions at Pokhran;
3. Pass an order to review the entire dangerous chain of processes or manufacturing nuclear weapons, from Uranium mining upto the disposal of the radioacive wastes;
4. Pass an order to investigate the consequences of test nuclear explosions at Pokhran;
5. Pass an order to compel the Government of India to disclose all the facts regarding the policy of making nuclear weapons;
6. Pass an order to stop production of all nuclear arms by the Government ot India.

With regards, Yours faithfully,
Date :

Signature Name Address

বিক্ষোভপ্রতিবাদমিছিলসমাবেশ আবেদনআন্দোলনআলোচনা

এগারোই এবং তেরোই মে'র পর থেকেই বহু বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিটিং মিছিল প্রতিবাদপত্র দেওয়া সই সংগ্রহ করা ইত্যাদি হয়েছে এবং হচ্ছে। এই কলকাতাতেই এবং বাইরেও। অন্যান্য রাজ্যে এবং অন্যান্য দেশেও। কিছু তথ্য, আমরা যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো। এর সাথে কিছু মতামত মন্তব্য এবং ঘোষণাপত্রের বয়ানও প্রকাশ করা হলো। দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু বোমার পরীক্ষায় এক অংশের মানুষ যেমন উল্লসিত, তেমনি ক্ষুব্ধ বেদনাহত শঙ্কিত অন্য এক অংশের মানুষ। তাদের মধ্যে নানান পেশার নানান সামাজিক অবস্থানের মানুষ আছেন। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘিরে কিভাবে আন্দোলিত হয়েছে তাদের মন তার হদিশ মিলবে এই সব প্রতিবেদন থেকে।

এগারোই মে ভারত প্রথম দফায় কয়েকটি বোমার পরীক্ষা চালায়। পরের দিনই সুদূর আমেরিকার এম আই টি-তে কর্মরত ভারত ও পাকিস্তানের গবেষকরা একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে ই-মেইল-এর মাধ্যমে সই সংগ্রহের জন্য। অদ্ভুত যোগাযোগ-ই বলতে হবে যে, ওই দিনই সেখানে পাকিস্তানের এক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র-দৌড় নিয়ে একটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। সেই সভা থেকেই এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় সকলের সম্মতিক্রমে।

প্রথম প্রতিবাদপত্র সুদূর আমেরিকায় কর্মরত ভারত ও পাকিস্তানের গবেষক ছাত্রদের তরফ থেকে

ম্যাসেচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা এম আই টি-র দ্য অ্যালায়েন্স ফর এ সেকুলার অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটিক সাউথ এশিয়া, পাকিস্তান স্টুডেন্টস সোসাইটি এবং এম. আই. টি প্রোগ্রাম ইন সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড সোসাইটির পক্ষে 12 মে তারিখে প্রচারিত হয় এই প্রতিবাদপত্র :

"আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ ভারতের সাম্প্রতিক পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মিসাইল নিয়ে চলতি রেষারেষি এবং সাধারণ ভাবে এই ভূখণ্ডে সামরিক সজ্জার বাতাবরণ তৈরির জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। যদিও দুদেশ-ই জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই পাড়ছেন, কিন্তু আসলে তারা মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াচ্ছেন এবং দু-দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈরী ভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য করছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এমনিতেই যেখানে অর্থের এত টানাটানি, সেখানে সম্পদ মানুষের কল্যাণে না লেগে ব্যবহৃত হচ্ছে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরিতে। ভারত ও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী জিগিরে তা বানচাল হলো। তবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের এই উন্মত্ততার মুখে দাঁড়িয়ে আমরা শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

এই ঘোষণাটি প্রচারিত হয় বারোই মে। এর পরে ভারত আরো দুটি এবং পাকিস্তান পাঁচটি বোমার পরীক্ষা চালায়। — এর উল্লেখ স্বাভাবিক কারণেই নেই এখানে।

❑❑❑

ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচারিত যৌথ প্রতিবাদপত্র

ভারতের সাম্প্রতিক পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেশের ও দেশের বাইরের কিছু কিছু গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং গবেষকগণ একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন ই-মেইলের মাধ্যমে আদান প্রদান করে। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা কয়েকশো হবে। দেশের মধ্যেকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে

ছিল চেন্নাইয়ের ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথেমেটিকাল সায়েন্সেস, এলাহাবাদের মেহতা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, ভুবনেশ্বরের ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স, কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, চেন্নাই-এর স্পিক ম্যাথেমেটিকাল ইনস্টিটিউট, চেন্নাইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কলকাতার সত্যেন বোস ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট অফ বেসিক সায়েন্স, বাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বাঙ্গালোরের সেন্টার ফর থিওরেটিকাল স্টাডিজ, কলপক্কমের ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ, খড়গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, অমৃতসরের গুরুনানক দেব ইউনিভার্সিটি, মুম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, দিল্লীর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বাঙ্গালোরের এরোনটিকাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি। বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকিউ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাও পওলো বিশ্ববিদ্যালয়, তাইওয়ানের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট এবং লিঙ্কোপিন বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের প্রচারিত ঘোষণাপত্রটি ছিল এই রকম :

"গত কয়েকদিনে ভারত পাঁচটি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে, যার মধ্যে একটি ছিল থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা। দাবি করা হয়েছে যে স্ট্র্যাটেজিক কারণে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্য হয়ে এই পরীক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল এবং এর সাথে দাবি করা হয় যে এটা দেশের বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে একটি বিরাট বড় সাফল্য। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত গবেষকরা ভারত সরকারের এই আচরণে গভীর বেদনা এবং অসন্তোষ জানিয়ে এই কটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

পারমাণবিক বিস্ফোরণের এই পরীক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য বলে অযথা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে দেখানো উচিত হবে না। মনে রাখতে হবে পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত কারিগরির বেশিরভাগই হলো গোপনীয়তার আড়ালে লুকোনো সন্দেহজনকভাবে সংগৃহীত ও অর্জিত জ্ঞান। এটাকে দেখতে হবে অন্যান্য বিষয়ের, বিশেষ করে আরো দুরূহ কাজের যেমন পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিজাইন, তার নির্মাণ এবং সফলভাবে চালানোর মতো জটিল কাজের নিরিখে। যেটা আমরা অনেকদিন ধরেই করছি এবং সঙ্গতভাবেই সেজন্য আমরা গর্বিত বোধ করতে পারি।

এই পরীক্ষা দক্ষিণ এশিয়া ভূখণ্ডের পরিবেশকে অবধারিতভাবে কলুষিত করবে, এতদঞ্চলে চাড়িয়ে দেবে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, রেষারেষিকে আরও উশ্কে দেবে এবং এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়াসকে আরো কঠিন করে তুলবে। পারমাণবিক অস্ত্রধর দেশগুলো এই ধরণের অস্ত্রের সপক্ষে যেমন বুলি আওড়ায় যে, এটা নিরস্ত্রীকরণে সাহায্য করবে তেমনি ভারত সরকারও অনুরূপ বুলির আশ্রায় নিয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র নির্মূল করার প্রশ্নে ধারাবাহিকভাবে যে অবস্থান নিয়ে আসছিল আমাদের দেশ তা থেকে বিচ্যুত হলো এই

পরীক্ষার ফলে। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে সক্ষমতা প্রমাণ দেওয়ার পরেও অস্ত্র-দৌড় ঠেকাতে ভারত সেই অস্ত্র নির্মাণ থেকে বিরত থেকেছে এতদিন। এর সাথে সাথে পারমাণবিক অস্ত্র সম্প্রসারণ চুক্তি (NPT) এবং পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তিতে (CTBT) নানা ধরণের অসঙ্গতি ও বাদবিচারের কারণে প্রবল আপত্তি তুলেছিল আমাদের দেশ। তাজ্জবের ব্যাপার সরকারের কোনো কোনো মহল থেকে এবং প্রচার মাধ্যম থেকে এখন বলা হচ্ছে যে, আমাদের এবার এই চুক্তিতে সম্মতি দেওয়া উচিত এবং সই করা উচিত।

জাতীয় পর্যায়ে কোনো রকম আলাপ আলোচনা বা বির্তকের আগেই ব্যয়বহুল এই অস্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া হলো। আমরা বুঝতে পারছি না জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে এমন কি বিপদ দেখা দেওয়ার জন্য এমন পদক্ষেপ নিতে হলো, বিশেষ করে যখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পায়ণের মতো জরুরি বিষয়গুলো অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছিল জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে একটি আলোচনার সূত্রপাত করা হবে, কিন্তু আলোচনার সামান্য সুযোগ না দিয়েই বিরাট পরিবর্তন করা হলো চালু নীতির। ... যার ফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী।

এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্মরণ করতে চাই পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতার কথা। অতীতে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যারা লাগাতারভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের বিরোধিতা করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন, আমরা দৃঢ়ভাবে তার পেছনে দাঁড়াতে চাই। পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ককে আমরা ভুলে যেতে পারি না, যতই না বিজ্ঞান ও কারিগরি সাফল্যের বড়াই করি অথবা নিরাপত্তার নামে নানান কৌশলের হিসেব কষি। আর বিশেষ করে আমরা আজও শুনছি, কি ধরণের বাধ্যবাধকতা-র জন্য হিরোশিমায় পরমাণু বোমা ফেলতে হয়েছিল এবং চরম বিতৃষ্ণায় আমাদের দেখতে হয়েছিল 1997 সালে গাল্‌ফ যুদ্ধকে মার্কিন প্রচার মাধ্যম কিভাবে ব্যবহার করেছিল প্রযুক্তি কলাকৌশলের প্রদর্শনী হিসেবে। এরপরেও কি আমরা এমন এক পৃথিবীতে সুখি এবং নিরাপদ বোধ করতে পারি যেখানে প্রতিটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে গর্ব বোধ করছে এবং 'ডেটারেন্স' নামক কৌশলে নির্ভর করে নিশ্চিন্ত আছে?

❑❑❑

পাকিস্তানে প্রতিবাদী উদ্যোগ

পাকিস্তানে বহু ব্যক্তি, ছোট ছোট সংগঠন, রাজনৈতিক দল একত্রে মিলিত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরমাণু বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে। তাদের এই আন্দোলনের নাম দিয়েছেন "The Action Committee Against Arms Race" বা সংক্ষেপে ACAAR। তাঁদের বক্তব্য হলো শুধু পরমাণু অস্ত্রই নয়, সব ধরণের অস্ত্রের প্রতিযোগিতাই অনৈতিক। কারণ এর আর্থিক

বোঝা এই ভূখণ্ডের মানুষকে ভাত কাপড় শিক্ষা বাসস্থান চাকুরি ইত্যাদির অধিকার থেকেই কেবল বঞ্চিত করছে না, তাদের এবং তাদের বংশধরদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করছে। তারা জানাচ্ছে যে, ভারতের পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণের দেখাদেখি পাকিস্তান সরকারও চাঘাই এলাকায় ছটি বোমার পরীক্ষা চালিয়ে তাদের শক্তি জাহির করল। যখন এই ভূখণ্ডের মানুষ, অন্য সব প্রয়োজনের কথা দূরে থাক, প্রতিদিনের সামান্য পানীয় জলটুকুর জন্যও রাস্তায় মারামারি করে মরছে। ACAAR-এর পক্ষ থেকে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়েছে তার হুবহু ইংরেজি বয়ানটিই প্রকাশ করা হলো।

"The recent series of 5 nuclear tests by India and 6 by Pakistan (a bloody blow to the on-going efforts to improve Pak-India relations), the ongoing escalation of missile race by both the countries, and the general militarization of the region are matters of grave concern, not only for the people of the two countries but for the whole of South Asia. Although all this is being done in the name of national security, these actions serve only to heighten tensions and hostilities in the region, further aggravating insecurities for each country. It is tragic that precious resources that should be used for the welfare and betterment of the people are instead being squandered on weapons of mass destruction in unimaginable proportions.

The nuclear tests carried out by the BJP-led government in India had exposed the true designs of that fascist, religious fundamentalist party of the upper castes. The BJP which has polled hardly 30% of the votes cast in the recent Indian general elections had no mandate from the people of India to indulge in such a criminal exercise which has taken the India-Pakistan cold war and arms race to a new stage of nuclearisation of the subcontinent with all its alarming consequences. Similarly, in the 1997 elections the people of Pakistan had not given the Pakistan Muslin League or Nawaz Sharif any mandate to conduct nuclear tests or make nuclear weapons.

While the BJP and its allies were rejoicing amidst the euphoria generated by India's nuclear tests, their counterparts in Pakistan like Jamat-i-Islami and its fellow-travellers were clamouring for giving a befitting reply to India by conducting Pakistan's own nuclear tests. It was pathetic to see that the Pakistan People's Party and its leader Benazir Bhutto is trying to outdo the religious, sectarian and jingoist elements in this campaign in support of the nuclear bomb. And, it is disgusting now, after Pakistan has carried out six tests, to hear the same person warning everyone of the dangerous

implications of the Pakistani nuclear tests for national security. In their blind pursuit of paranoid nationalism, the vainglorious elements in both countries remain blissfully unaware of the mass destruction potential of nuclear weapons. They do not understand that nuclear weapons are evil, mass annihilators of human life and are morally indefensible, which no country should possess and that it is the moral responsibility of the citizens of every country to try and prevent their country from ever possessing these terrible weapons.

Even some of the leading military generals in the West who had their fingers on the nuclear buttons have publicly come out to say no to nuclear weapons. How can countries like India and Pakistan which cannot even bear the burden of buying, leave alone manufacturing conventional weapons, except at the expense of the basic needs of their peoples, bear the astronomical cost of testing and manufacturing nuclear weapons? And, has anyone among the protagonists of the nuclear bomb ever thought of not only the massive destruction and devastation in terms of human lives that a nuclear bomb of any denomination will bring upon the targeted territory and far beyond but also its devastating consequences upon generations upon generations of human beings, animals and plants for decades to come? We do not wish to quote figures because they are too frightening to look at. The worst victims of this war-mongering, arrogant and competitive nationalism (fraudulently rationalised in the name of "security") are ordinary people. The social and economic costs of development, forgone thanks to military posturing, have already proved onerous. For all the official bluster about pursuing "national greatness", India and Pakistan both feature, by all accepted indices, at the bottom of the human development ladder.

As for Pakistan (which is also applicable to India) an economically stable Pakistan with strong democratic instituions and without nuclear bombs will be many times more secure than an economically shattered Pakistan with a few nuclear weapons in its arsenal but with a population robbed of their basic human right to a decent existence. This is a lesson one should have learnt from the fate of the mighty Soviet Union which collapsed and disappeared, not because it had no nuclear weapons and delivery systems but in spite of having so many of them. Soviet economy fell victim to the armaments race, the nuclear race and crashed under its weight, and with it went down the Soviet State.

The already entrenched international Nuclear Club has

already demonstrated its inability to stop any country from going nuclear. If the countries of this exclusive club are sincere about every country signing what they call the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) and Non-Proliferation Treaty (NPT), they should set an example by starting to dismantle their own nuclear arsenals first.

The United Nations should make nuclear non-proliferation an integral part of its programme rather than an exclusive club dictating terms to other countries.

In the face of the ongoing jingoistic rhetoric of the nuclear lobbies of the two countries, followed by the suspension of people's fundamental rights under a state of emergency in Pakistan, there is an urgent need to take a bold initiative towards developing a peoples' peace movement in the subcontinent, and also globally, that aims at people-to-people reconciliation and maximal economic, political and social progress for all the peoples of South Asia through close regional co-operation. To promote peace and peacebility is the most urgent task of all the people of goodwill and liberal outlook. It is high time the peoples of South Asia took a bold initiative and forced their governments to publicly announce the renunciation of nuclear tests and production of nuclear weapons and missiles.

It is heartening to see peace-loving forces in India too protesting everywhere against the Indian nuclear tests and condemning the BJP Government. We appeal to all such organisation and individuals in Pakistan who are striving from different platforms for peace in the subcontinent, to link up with the ACAAR so that a grand national peace movement may emerge as part of a larger South Asian and international movement for peace and democracy at this hour of grave peril of our very existence."

Yusuf Mustikhan, Convener (ACAAR)

43/3-C, Shah Abdul Latif Road, Block-6, PECHS, Karachi.

এই ঘোষণাপত্রে মোট একষট্টি জন সই করেছেন। এদের প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সংগঠন বা পার্টির পক্ষে সই করেছেন। যেমন, Prograssive Writers Association, Railway Mehnatkash Union, Social Democrative Movement, Jeaye Sindh Mahaz, Saraiki National Party, Forum for Peace and Development, Forum for Social Studies, Pakistan Workers Confederation, ইত্যাদি। বহু সংগঠন রয়েছে যাদের পুরো নাম নেই। যেমন, PND, IDI, CMKP, LPP, HRCP, PILER, AJP, ইত্যাদি। এছাড়াও আছেন কিছু ডাক্তার, সাংবাদিক এবং ছাত্র ইত্যাদি।

❑❑❑

বিদেশে বসবাসকারী দক্ষিণ-এশীয়দের প্রতিবাদপত্র

বিদেশে বসবাসকারী বিরাট সংখ্যক দক্ষিণ এশীয় নাগরিক এবং দুনিয়াজুড়ে তাদের বন্ধু-বান্ধব ভারত ও পাকিস্তান সরকারের পরমাণু বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেছে। এটি 19 এবং 26 জুনের India Abroad এবং 19 শে জুনের India West-এ প্রকাশিত হয়েছে।

RAISE YOUR VOICE AGAINST THE NUCLEAR TESTS IN INDIA AND PAKISTAN. AN URGENT APPEAL BY SOUTH ASIANS AND THEIR FRIENDS FROM ALL OVER THE WORLD

On May 11 and 13, 1998, the less-than-two-month old Vajpayee government of India carried out five nuclear tests in Rajasthan, an incident that jolted the subcontinent and shocked the world. In retaliation, the Nawaz Sharif government of Pakistan on May 28 and 30 tested its own nuclear devices in Baluchistan. Since the blasts took place in India, inflammatory statements and intemperate language have replaced normal political dialogue in South Asia. The voice of those who oppose nuclear weapons in India, politicians as well as common people, has been disregarded in the heady rejoicing about the recently acquired capacity to kill innocent people indiscriminately. In Pakistan, a symmetrical and unreal fervor for nuclear weapons has taken hold of the people and government, beginning with the testing of the intermediate range missile.

In USA and Europe, pro-BJP and pro-RSS groups have been campaigning in support of their parties' action, and are now asking NRIs to flow money into India to bail the coalition government out of its self-inflicted fiscal troubles created due to economic sanctions placed on India by USA, Japan, and quite a few other countries. Similarly, the Pakistani government is soliciting massive contributions from its own citizens living abroad. We say to you to help needy people who are suffering, but do not pay for war-mongering and arms build-up.

India and Pakistan have fought three wars and have ramained hostile to each other since 1947. The intolerance exhibited by the present governments has severed the lines of communication that had recently opened up between the two countries. The implications of the BJP government's departure from India's traditional foreign policy for peace in South Asia (a policy that has been based on *Panchsheel* and compassion) and the ensuing threat of a nuclear arms race in the region are something that should trouble all peace-loving people of

the world. Other than the danger of possible radioactive fallouts from such tests, we are deeply concerned that the poor citizens of India and Pakistan will have to bear the brunt of massive expenses to build nuclear weapons, because such expenses that India and Pakistan can hardly afford are now going to be heaped by these govenments on poor people, thereby putting their already difficult lives in serious jeopardy.

We want global peace and disarmament, and not escalation of wars. We strongly deplore the nuclear weapons and missiles programs in India and Pakistan. The peace-loving people of South Asia must not be provoked by these irresponsible acts. The two countries should enter into negotiations to eliminate the immediate danger of a nuclear conflict, and then to de-escalate gradually in mutually verifiable steps.

OUR PEOPLE NEED PEACE AND PROGRESS, NOT BELLIGERENCE AND BOMBS

Contact : e-mail address : Partha @ capital. net.

❑❑❑

পাকিস্তানে পরমাণু-বোমা বিরোধী সমাবেশে হামলা

তেসরা জুন এএপি নিউজফিড থেকে খবর দিচ্ছে যে আগের দিন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরমাণু-বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে আয়োজিত এক সভা আক্রান্ত হয় জামাত-ই-ইসলাম দলের পতাকাধারী কিছু বিক্ষোভকারীর দ্বারা। সভার আয়োজক ছিল Pakistan India People's Forum for Peace and Democracy বা সংক্ষেপে PIPFPD। বিক্ষোভকারীরা এদের বিশ্বাসঘাতক এবং ভারতের চর বলে অভিহিত করে।

পরমাণু বোমা বিরোধী সমাবেশের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ খণ্ডন করে তারা দু-দেশেরই নেতৃত্বের কাছে এই ধরণের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে নিতে এবং সিটিবিটি-তে সই করে এই ভূখণ্ডে শান্তি ফিরিয়ে আনার পক্ষে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করেছে।

Union of Pakistan and Indian Journalists-এর পক্ষ থেকেও একটি বিবৃতি দিয়ে দুদেশের নেতৃত্বের কাছে এই বলে আবেদন রেখেছে যে তারা যেন অস্ত্র প্রতিযোগিতা ছেড়ে দেশের থেকে দারিদ্র ও অশিক্ষা দূরীকরণে সচেষ্ট হন। এই সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে যে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোরেও ছাত্রদের এক মিছিল হয় ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে।

❑❑❑

Indian Scientist Against Nuclear Weapons

সর্বভারতীয় পর্যায়ে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী প্রচার আন্দোলনের জন্য Indian Scientists Against Nuclear Weapons নাম দিয়ে এক মঞ্চ গড়ার উদ্যোগ চলছে। উদ্যোক্তা চেন্নাই-এর Institute of Mathematical Sciences-এ কর্মরত কিছু বিজ্ঞানী। যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ চিকিৎসক বা গবেষক-ছাত্ররা এর সদস্য হতে পারবেন। এমন একটি মঞ্চ গড়ার উদ্দেশ্য হলো পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে লাগাতার একটি প্রচার চালানো। এই মঞ্চে যোগাদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : Dr. T. Jayaraman, Institute of Mathematical Sciences, CIT Campus, Chennai-600 113 (e-mail : jayaraman @ imsc. ernet. in).

❑❑❑

শ্রীনগরে ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের হামলা

গত 22 মে এক ফরাসি সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে যে ভারতের পরীক্ষামূলক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র-জনতার মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠি চালায় এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য ছিল, এই পরীক্ষা দক্ষিণ এশিয়া ভূখণ্ডে অস্ত্রের দৌড় বাড়িয়ে দেবে এবং যে কোনো মুহূর্তে কাশ্মীর সীমান্তে আরেকবার বেধে যেতে পারে যুদ্ধ। সেজন্যই আতঙ্কিত বোধ করছেন তারা।

❑❑❑

বাংলাদেশের ছাত্রদের প্রতিবাদ

গত 17 মে 'স্টুডেন্টস্ ইউনিটি' নামের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের এক মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেরিয়ে ধানমণ্ডি-র ভারতীয় হাই কমিশনের অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ জানায়। তারা ভারতের সাম্প্রতিক পরমাণু বোমার পরীক্ষাকে এই ভূখণ্ডের ওপর 'আধিপত্য কায়েমে'র প্রয়াস বলে মনে করে এবং তারা আশা প্রকাশ করেছে যে, এই ভূখণ্ডের দেশগুলো এই ধরণের অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকবে। এর আগে বাংলাদেশের বি এন পি দলের ছাত্র সংগঠনের তরফ থেকেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সংবাদ দিচ্ছে ফরাসি প্রেস এজেন্সি।

❑❑❑

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী কে আর নারায়ণ-এর কাছে ভারতের নিউক্লিয় বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন।

[সূত্র : গিনহুয়া নিউজ এজেন্সি, 28.5.98]

31 মে হিরোশিমাতে বহু সংখ্যক মানুষ পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়েন, সঙ্গে ছিল 1945-এর বোমা বিধ্বস্ত হিরোশিমার ছবির প্রদর্শনী।

[সূত্র : কিয়োডে নিউজ সার্ভিস]

কাঠমাণ্ডুর ছটি নাগারিক অধিকার রক্ষা সংগঠনের 22 জন কর্মী বোমা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালান।

[সূত্র : এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস]

24 মে, পিস অ্যাকসন, মাসাচুসেটস্-এ পাকিস্তান ও ভারতের দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একই দিনে একই সময়ে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কালিফোরনিয়া, কলরাডো, মেইন, মিসিগান, নেব্রাস্কা, নিউইয়র্ক, গ্লেন, ওহায়ো প্রভৃতি শহরেও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

[সূত্র : ইউ এস নিউজ ওয়্যার]

13 মে, ওয়াশিংটনের রাস্তায়, কংকালের মুখোশ পরে বহু মানুষ ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা একই সঙ্গে মার্কিন সরকারের নিউক্লিয় অস্ত্রের প্রশ্নে দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

[সূত্র : এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস]

25 জুন প্রায় 400 বিক্ষোভকারী লাহোরে পাঞ্জাব বিধানসভা ভবনের সামনে প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করে ভারত পাকিস্তানের নিউক্লিয় অস্ত্র বিস্ফোরণ, ভারত-পাকিস্তান শত্রুতা, পাকিস্তানের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভের আয়োজক ছিলেন অনেকগুলি সংস্থা।

[সূত্র : *দ্য নিউজ*, (পাকিস্তান) 28.6.98]

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের যেসব মানুষ 1947 পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন তাঁদের পক্ষ থেকে ভারত, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে নিউক্লিয় অস্ত্র এবং নিউক্লিয় যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে আবেদন করে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে। বিবৃতি দাতাদের পক্ষে এই আবেদনটি প্রচার করেছেন ইস্‌তিয়াখ আহ্‌মেদ, সাউথ এশিয়া এগেনসট্ নিউক্স।

সিমন ফ্রেসার বিশ্ববিদ্যালয়, ভ্যাঙ্কুভার, কানাডাতে নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানস্ ফর সেক্যুলারিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ও অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে ভারত ও পাকিস্তানের নিউক্লিয় বিস্ফোরণ বিরোধী দুটি সভা হয়। ব্রিটিশ কলম্বিয়া অঞ্চলের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় উদ্ভূত নাগরিকরা ভারত ও পাকিস্তানের নিউক্লিয় অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন বিক্ষোভের কর্মসূচী তৈরি করছেন।

[সূত্র : NRISAD-এর অন্যতম আহ্বায়ক ড. চিন ব্যানার্জির ই-মেইল থেকে।]

পরিক্রমা

এক নজরে ভারতের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড

ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয় 1954 সালে। প্রথম রিয়াক্টরটি দেয় কানাডা। 1960 সালে। এর জ্বালানি আসে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে। 1966 সালে বসানো হয় ছোট আকারের প্রথম রি-প্রসেসিং প্ল্যান্ট। .... ফ্রান্স ও মার্কিন সংস্থার সহায়তায়। প্রথম রিঅ্যাক্টরের জ্বালানি থেকে পাওয়া প্লুটোনিয়াম-ই ব্যবহার করা হয়েছিল 1974 সালের প্রথম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য। তখন ভারতের পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের ওপর আন্তর্জাতিক নজরদারির ব্যবস্থা ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা ভারতকে আরও চারটি রিয়াক্টর দেয়।

বড় আকারের রিপ্রসেসিং প্ল্যান্ট বসানো হয় 1973 থেকে 1978 সালের মধ্যে। তারাপুরে বসানো হয় সেগুলো। সহায়তা দিয়েছে ফ্রান্স, 1993 সাল অবধি। ইউরেনিয়ামও এসেছে ফ্রান্স থেকে। রাজস্থানের রিঅ্যাক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী জল দিয়েছে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

বর্তমানে ভারতে দশটি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর রয়েছে। ইউরেনিয়াম পরিশোধনের ব্যবস্থাও আছে। 1985 সালে ধ্রুব নামের যে রিঅ্যাক্টর বসানো হয় তা থেকে বছরে আড়াই কিলোগ্রামের মতো প্লুটোনিয়াম পাওয়া যায়। 1986 সাল থেকে মাদ্রাজের রিয়াক্টর থেকেও প্লুটোনিয়াম পাওয়া যাচ্ছে। অনুমান করা হয় যে বর্তমানে বছরে 75 থেকে 200 কিলোগ্রামের মধ্যে যে কোনো পরিমাণ প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। যা পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনের বেশ কয়েকগুণ বেশি।

❑❑❑

ভারতের মিসাইল ও সাবমেরিন কর্মকাণ্ড

ভারত ইতিমধ্যেই পারমাণবিক বোমা বহন-ক্ষম মিসাইল তৈরির কাজে বেশ খানিকটা এগিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ভারতকে রকেট-প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই 1960 সালে। 1992 সালে ভারত তরল জ্বালানি-নির্ভর তিনটি মিসাইল ইঞ্জিন এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত তথ্য কিনেছিল রাশিয়ার কাছে থেকে। এর মধ্যে ভারত বেশ কয়েকটি মিসাইল উৎক্ষেপণের পরীক্ষা করেছে। মোটামুটি দু-ধরণের মিসাইল সেগুলি। 2500 কিলোমিটার পাল্লার 'অগ্নি' এবং 250 কিলোমিটার পাল্লার 'পৃথ্বী'। এছাড়াও আছে অন্য ধরণের স্বল্প পাল্লার রকেট।

পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিন প্রস্তুতের পরিকল্পনাও রয়েছে ভারতের।

1988 সালে লিজের ভিত্তিতে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল 'চার্লি' নামের সাবমেরিন। 1992 সাল থেকে দেশেই সাবমেরিন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সোভিয়েত ডিজাইনের ভিত্তিতে। এর রিঅ্যাক্টরের জন্য বোমার উপযোগী মানের পারমাণবিক জ্বালানির প্রয়োজন। এই ধরণের সাবমেরিন সব দেশেই পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়।

এই সাবমেরিন তৈরির প্রকল্প ভারতের নৌ-বিভাগ এবং পারমাণবিক শক্তি বিভাগের যৌথ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এর সাথে সমান্তরালভাবে চলছে সমুদ্র থেকে নিক্ষেপের উপযোগী মিসাইল 'সাগরিকা'র নির্মাণ কাজ।

❑❑❑

বিশ্বজুড়ে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের খতিয়ান

প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উনিশশো পয়তাল্লিশ সালের 16 জুলাই। সেই বোমার সাংকেতিক নাম ছিল 'ট্রিনিটি'। পরীক্ষাস্থল ছিল নিউ মেক্সিকোর আলামোগোর্ডো। এর পরের পরীক্ষা চালায় প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন। 1949-এর 29 আগস্ট। এরপরে ক্রমান্বয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন ও ভারত প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায় যথাক্রমে 1952-র 3 অক্টোবর, 1960-এর 3 ডিসেম্বর, 1964-এর 16 অক্টোবর ও 1974-এর 18 মে। অতি সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার অনুরূপ পরীক্ষা সংঘটিত করল গত 28 মে 1998 তারিখে।

থার্মোনিউক্লিয়ার তথা হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1952-র পয়লা নভেম্বরে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এনিওয়েটক আটোলে করা হয় প্রথম পরীক্ষা। বোমার সাংকেতিক নাম ছিল 'মাইক'। ট্রিনিটির তুলনায় এই বোমা ছিল পাঁচশ গুণ ক্ষমতাশালী। 10 মেগাটন বিস্ফোরণ ক্ষমতার। এর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুরূপ বোমার পরীক্ষা চালায় 1955-র বাইশে নভেম্বর। অন্যান্যদের মধ্যে ব্রিটেন, চীন এবং ফ্রান্স এই রকম বোমার পরীক্ষা করে যথাক্রমে 1957 এর 8 নভেম্বর, 1967-র 17 জুন এবং 1968-র 24 আগস্ট।

এই পর্যন্ত মোট 1030 টি বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছিল 715 টির। ফ্রান্স করেছে 210 টির। ব্রিটেন করেছে 45 টির এবং চীন করেছে 43 টির। এছাড়া ভারত এবং পাকিস্তান করলো ছটি করে।

এই পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি সময়ের পরিসরে মোট 2056 টি বোমার পরীক্ষা হলো অর্থাৎ 1945 থেকে গড়পড়তা প্রতি ন'দিনে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একটি করে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। বিগত দেড় বছর ধরে কোনো পরীক্ষা হয় নি। এর আগে অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে প্রতি 17 দিনে একটি, সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে প্রতি 23 দিকে একটি, ফ্রান্স গড়ে প্রতি 63 দিনে একটি, চীন প্রতি 222 দিনে একটি এবং বৃটেন 349 দিনে একটি করে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

হরেক ধরনের পরিবেশে এই বোমার পরীক্ষা হয়েছে। মাটিতে হয়েছে, মাটির ওপরে আকাশে হয়েছে, জলের তলায় হয়েছে, উঁচু টাওয়ারের ওপর হয়েছে, বেলুন থেকে ঝুলিয়ে হয়েছে, প্লেন থেকে ফেলে হয়েছে, রকেট থেকে ছুঁড়ে হয়েছে এবং মাটির তলায় হয়েছে। ❑

অস্ত্রশস্ত্রের খরচপাতি

ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র-প্রকল্প অথবা মিসাইল প্রকল্প ইত্যাদিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় তার হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেসব গোপনীয় হিসেব। ফলে অনেকের মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলেও তার সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই খাতে ব্যয় সংক্রান্ত নথিপত্র মাঝে মধ্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সেই তথ্য ঘেঁটে বহু বইপত্র লেখা হয়েছে। তা থেকে কিছু হিসেব উদ্ধৃত করা হলো। আন্দাজ মিলবে কি পরিমাণ অর্থ লাগে এহেন প্রকল্প চালাতে এবং তার জেন সামলাতে। মূলত এগুলি গবেষণা, উন্নয়ন এবং পরীক্ষা খাতের ব্যয়।

বিষয়	1996 সালের মূল্যমানে মার্কিন কোটি ডলারে ব্যয়
* প্রথম পারমাণবিক বোমা প্রকল্প ম্যানহ্যাটন প্রজেক্ট (1942–1945) (মোট চারটি বোমা তৈরী হয়েছিল)	2,000
* 1946 সালে বিকিনি আটোলে অস্ত্র পরীক্ষার ব্যয়	130
* প্রতিটি B52H স্ট্র্যাটোফরট্রেস বম্বারের খরচ	4.29
* প্রতিটি B2A স্পিরিট বম্বারের খরচ	260
* প্রতিটি মিনিটম্যান III মিসাইলের খরচ	3.35
* প্রতিটি এম এক্স পীসকীপার মিসাইলের খরচ	18.9
* প্রতিটি ট্রিডেন্ট সাবমেরিনের খরচ	190
* 1998 সালে মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ	3500
* পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের আনা মামলা লড়ায় সরকারী ব্যয়	9.7
* পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ব্র্যাভো টেস্টের ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণে ক্ষতিগ্রস্ত জাপানীদের দেয়া ক্ষতিপূরণ	1.53
* পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষাক্ষেত্রে মার্বেল আইল্যান্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের দেওয়া ক্ষতিপূরণ	75
* 6336 টি ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় বিকিরণে ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন নাগরিকদের দেয়া ক্ষতিপূরণ	22.5

সূত্র : Brookings Lib. (ইন্টারনেট থেকে নেওয়া) র. চ.

পরমাণু বিষয়ে অতীতে *বিওবিতে* প্রকাশিত রচনা

1. পরমাণু শক্তির আসল রূপ : অভিজিৎ লাহিড়ী, নভেঃ-ডিসে, '78
2. The future of Nuclear Science in India : অমিতাভ দত্ত, মার্চ-এপ্রি, '80
3. তারাপুর দুর্ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে? : পার্থ সেন, মে-জুন, '80
4. মাইক্রোনিশিয়া আমেরিকার নয়া হিরোশিমা-নাগাসাকি : পার্থপ্রতিম মজুমদার, নভে-ডিসে, '83
5. India's Nuclear Paradox : অভিজিৎ লাহিড়ী. নভে-ডিসে, '80
6. পরমাণু শক্তি সম্পর্কে : প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, নভে-ডিসে, '80
7. নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে জাপান বিজ্ঞান সমিতির বিবৃতি, জানু-ফেব্রু, '81
8. পরমাণু অস্ত্র বিরোধী বিক্ষোভ দেশে দেশে, জানু-ফেব্রু, '82
9. ফিউশন রিয়্যাক্টর বানানোর অসুবিধে কোথায় : উদয়ন বসু, জানু-ফেব্রু, '82
10. নিউট্রন বোমা জিনিষটা কি? : মার্চ-এপ্রি, '82
11. পৃথিবীর নিয়তি (পুস্তক পরিচিতি) : রবীন মজুমদার, সেপ্টে-অক্টো, '82
12. মানবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব : সেপ্টে-অক্টো, '82
13. তেজস্ক্রিয় আর্বজনা—কারিগরী, রাজনীতি, ঝুঁকি : সত্যবান রায়, সেপ্টে-অক্টো, '82
14. নতুন ধরণের দুর্ঘটনা : অভিজিৎ লাহিড়ী, মার্চ-এপ্রি, '83
15. তারাপুর কত পার্সেন্ট বিপজ্জনক : পাটিগণিতের প্রশ্ন, মে-জুন, '83
16. মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন : দেবাশিস গাঙ্গুলী, জুলা-আগ, '83
17. Stop N. Power ডেনমার্কের সিদ্ধান্ত : মার্চ-এপ্রি, '85
18. পারমাণবিক চুক্তির সঙ্কট : সুখেন্দু সরকার, '85
19. পারমাণবিক অথবা মানবিক ভারত : সৌমেন গুহ, সেপ্টে-অক্টো, '85
20. উপমহাদেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্ররোধের প্রস্তাব : সেপ্টে-অক্টো, '85
21. পরমাণু বোমার মানসিকতা — ভারতে : রবীন মজুমদার, সেপ্টে-অক্টো, '85
22. ডেনমার্কের নিউক্লিয়ার বিরোধী আন্দোলন ও সফলতা : সেপ্টে-অক্টো, '85
23. নিউক্লিয় যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি "দ্য ডে আফটার" : সেপ্টে-অক্টো, '85
24. 1,20,000 থেকে 10,000 গেলে — রইল বাকি কত? : নভে-ডিসে, '85
25. Ground-এর নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিরোধিতা : সৌমেন গুহ, নভে-ডিসে, '85
26. পরিবেশের খবর : নিউক্লিয়ার আবর্জনা ডাম্পিং : জানু-ফেব্রু, '86
27. ভারতে পারমাণবিক শক্তি : ডি ডি কোসম্বী (অনু. সুপর্ণ চৌধুরী) ; মার্চ-জুন, '86
28. তিরিশটি নিউক্লিয়ার প্রশ্ন : রবীন চক্রবর্ত্তী, মার্চ-জুন, '86
29. নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনায় গোপনীয়তা : অভিজিৎ লাহিড়ী, মার্চ-জুন, '86
30. চের্নোবিল : সুপর্ণ চৌধুরী, জুলাই-আগ, '86
31. প্রথম অ্যাটম বোমা প্রকল্প — অধ্যাপক ডেভিড বোমের সাথে সাক্ষাৎকার : দীপঙ্কর হোম (অনু. সুপর্ণ চৌধুরী), নভে-ডিসে, '86
32. সোভিয়েত ব্যবস্থায় নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি : সুরঞ্জন কর, জানু-ফেব্রু, '86
33. পরমাণু তুমি কার — বিজ্ঞানের না ব্যবসার : মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, মার্চ-এপ্রি, '87
34. পারমাণবিক শক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ (সূত্র : ধীরেন্দ্র শর্মার বই), : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্চ-এপ্রি, '87
35. পরমাণু সাম্রাজ্যের অন্দরমহল : মে-আগ, '87
36. পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টে-ডিসে, '87
37. পারমাণবিক চুল্লী স্থাপন ঃ কোথায় কখন? : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, জানু-ফেব্রু, '88
38. ফ্রান্স ফের শুরু করলো নিউক্লিয় বোমার পরীক্ষা : জুলা-আগ, '95
39. সিটিবিটি : এপ্রি-সেপ্টে, '96
40. নিউক্লিয়ার এনার্জির হাল হকিকৎ : অক্টো-ডিসে, '96
41. নিউক বিরোধী জনস্বার্থে মামলা হোক : জানু-জুন, '97

সংকলক : মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী

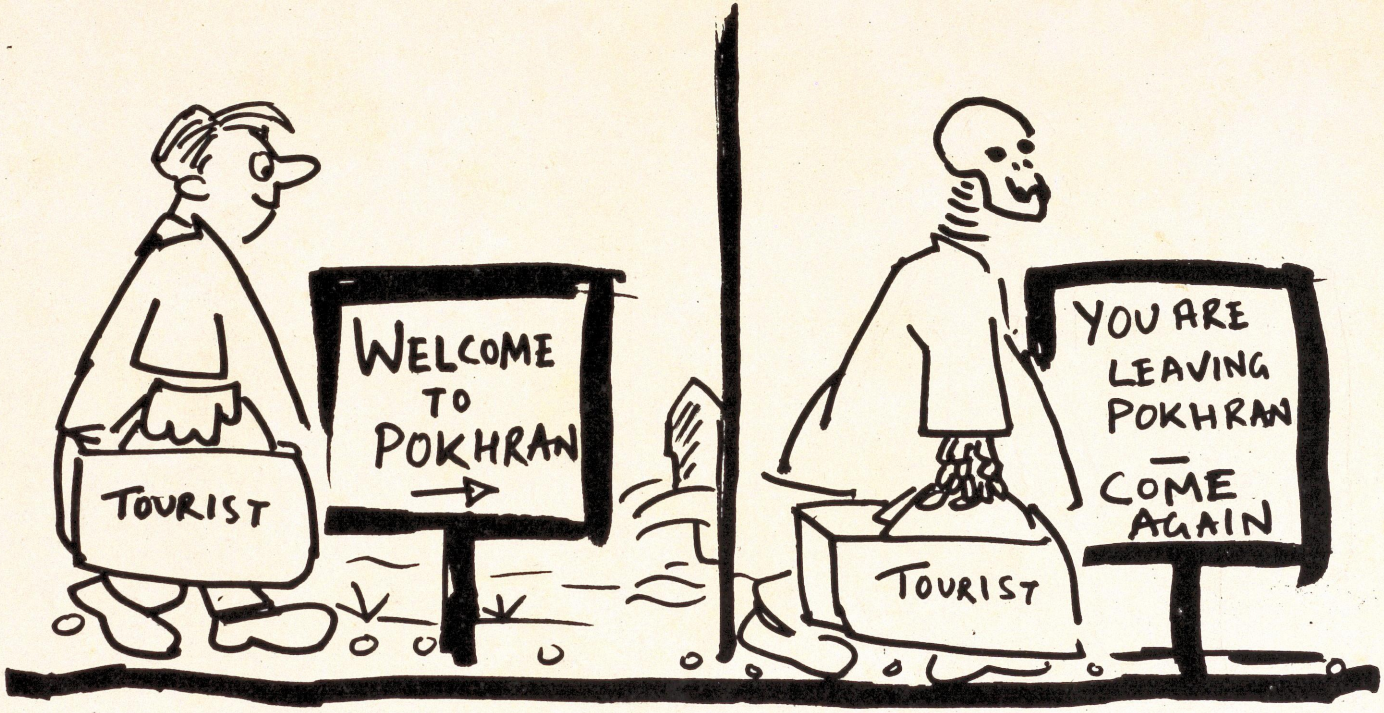
TOURIST
WELCOME TO POKHRAN
TOURIST
YOU ARE LEAVING POKHRAN — COME AGAIN

VIGYAN-O-VIGYANKARAMI (R. N. 34929/79) Rs. 35.00
P 252, Lake Town, Block-A, Cal-89

Vol XX, No. 3, 4 July-December 1998

A Poem By

Sahir Ludhianwi

AI SHAREEF INSANOS	**DEAR CIVILIZED PEOPLE**
Khoon apna ho ya paraaya ho	Be this blood ours or theirs
Nasl-e-adam ka khoon hai aakhir	Humanity is bloodied
Jang maghrib mein ho ke mashriq mein	Be this war in East or West
Amn-e-aalam ka khoon hai aakhir	A peaceful earth is bloodied
Bam gharon par giren ke sarhad par	Whether the bombs fall on homes or borders
Rooh-e-taameer zakhm khaati hai	The spirit of construction is wounded
Khet apne jalein ke auron ke	Whether it is our fields that burn or theirs
Zeest faaqon mein tilmilaati hai	Life is wrecked by starvation
Tank aage badhen ke peeche haten	It matters not that tanks advance or retreat
Kokh dharti ki baanjh hoti hai	The womb of the earth bceome barren
Fat-ha ka jashn ho ke haar ka sog	Be it a celebration of victory or loss' lament
Zindagi mayyaton pe roti hai	The living must mourn the corpses
Is liye ai shareef insaano,	That is why, O civilized people
Jang talti raheto behtar hai	It is better that war remains postponed
Aap aur hum, sabhi ke aangan mein	In your homes, and in our
Shama jalti rahe to behtar hai	It is better that lamps continue to flicker

পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক ও নাগরিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে যে Action Commitee Against Arms Race (ACAAR) নামের মঞ্চ গড়ে উঠেছে তাদের তরফে প্রচারিত ঘোষণাপত্রের [এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত] শুরুতেও বিখ্যাত উর্দু কবি লুধিয়ান্‌ভির এই কবিতাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।